নানান দেশের রূপকথা



সুখলতা রাও



নানান দেশের রূপকথা



সুখলতা রাও





মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

ষষ্ঠ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৯২

—দশ টাকা—

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—শ্রীকানাই পাল

মুদ্রণ—ফাইন আর্ট প্রিন্টার্স

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
উপেন্দ্র প্রিন্টিং প্রেস, ১৬ ভীমঘোষ লেন কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীসত্যহরি পান কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

মুনিয়া পাখি

সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই পৃথিবী তৈরী করে তার উপরে বিছিয়ে দিলেন নানা রঙের ফুলের গালিচা। বনের গাছগুলিকে তিনি মন্দিরের মত উঁচু করে তুললেন। তার পর ভাবলেন,—এই সব মন্দিরে গান গাইবে কারা? তখন সৃষ্টি করলেন পাখিদের।

ছোট বড় কত পাখি তৈরী হল, কত ধরনের কত গড়নের। সব পাখি গড়া হয়ে গেলে, তিনি তাদের বললেন, "তোমরা সারি বেঁধে দাঁড়াও, তোমাদের গায়ে রঙ লাগাব।" তখন বড় পাখিরা সকলে দাঁড়াল সামনে, তাদের পিছনে দাঁড়াল ছোট পাখিরা। খুব ছোট্ট পাখিদের ভিতর ছিল একটি পাখি—ভারি চুলবুলে,—নাম তার মুনিয়া। সে কেবলি কিচির কিচির করে লাফালাফি করছে, কিছুতেই সারির সঙ্গে দাঁড়াতে পারছে না। সে ভাবছে,—উঃ, কত লম্বা সারি, কখন যে আমার পালা আসবে!



অপেক্ষা ক'রে ক'রে হয়রান হয়ে শেষটায় সে ফুরুর্‌র্‌ ক'রে উড়ে গেল একেবারে নীল আকাশে, সাদা মেঘের গায়ে। নিচের দিকে চেয়ে দেখল,—কী চমৎকার এই সবুজ পৃথিবীটা। ভারী খুশি হয়ে সে উড়ে বেড়াতে লাগল, পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে।

হঠাৎ মনে পড়ল যে তার গায়ে রঙ দেওয়া হয় নি। তাই তো, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সে ফিরে চল্‌ল যেখানে সব পাখিরা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই মাঠের দিকে। কিন্তু গিয়ে ছাখে মাঠ খালি, কোনো পাখি নেই সেখানে। সৃষ্টিকর্তা তাঁর কাজ শেষ করে রঙের তুলি ধুতে আরম্ভ করেছেন।

তাই দেখে ছোট্ট পাখিটি একটা গাছের ডালে বসে কাঁদতে লাগল। সৃষ্টিকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "কাঁদছ কেন তুমি?" মুনিয়া বল্‌ল, "আমি পৃথিবী দেখব ব'লে উড়ে গিয়েছিলাম, ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল।" বলে, সে আবার কাঁদতে লাগল। তার কান্না দেখে তাঁর দয়া হল।

তিনি বললেন, "আচ্ছা এস, দেখি কি করতে পারি।" মুনিয়া পাখি নেচে নেচে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য পাখিদের আঁকতে সমস্ত রঙ ফুরিয়ে গিয়েছিল, ছিটে-ফোঁটা পড়ে ছিল কেবল। সেই ছিটে-ফোঁটা দিয়ে তিনি চমৎকার করে এঁকে দিলেন মুনিয়া পাখির পালক।

দশ হাজার রত্ন

জাপান দেশে, এক সৈনিক সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে, তার চোখের সামনে, কিম্ভূতকিমাকার একটা জীব, জল থেকে বালির উপরে উঠে এল। তার প্রকাণ্ড শরীর আঁশে ভরা। সৈনিক তাড়াতাড়ি খাপ থেকে তলোয়ার বের করল সেটাকে মারবার জন্য। কিন্তু জন্তুটা ভয় পেল না পালালো না, কেবল করুণভাবে চেয়ে রইল যোদ্ধার দিকে। তখন সে জন্তুকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে হে?"

"আমি সামেবিতো", উত্তর এল, "সমুদ্রের দানব রাজা আমার উপর রেগে গিয়ে, সমুদ্রের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন আমাকে। ডাঙ্গায় তো আমি বাঁচব না। তুমি মারলেও মরে যাব।"

এই শুনে যোদ্ধার দয়া হল। সে তাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, ছেড়ে দিল একটা মস্ত পুকুরে। পুকুরের ধারে ধারে পদ্ম ফুল ফুটত। যোদ্ধা রোজ ভাল ভাল খাবার এনে খেতে দিত তাকে।

বেশ সুখে দিন যায়। হঠাৎ মুশকিল দেখা দিল। সৈনিকের ইচ্ছা একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে। মেয়ে বলে, "আগে দশ হাজার রত্ন এনে দাও, তবে আমি বিয়ে করব।"

কোথায় পাবে সে এত রত্ন? তার সামান্য জমিজমা যা আছে, আর বাড়িখানাও বিক্রি করলে এত টাকা উঠবে না, যা দিয়ে দশ হাজার রত্ন কেনা যায়। কাজেই সে বেচারা মনমরা হয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, বিছানায় শুয়ে পড়ল, খেল না দেল না।

এদিকে সামেবিতো ভেবে অস্থির, মনিব কেন আসছে না তার কাছে। ভেবে ভেবে, আর থাকতে না পেরে, সে জল ছেড়ে উঠে, নিজের প্রকাণ্ড শরীরটা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে নিয়ে চল্‌ল মনিবের বাড়ির ভিতর। সৈনিক তাকে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, "হায় সামেবিতো, তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা। আমি আর বাঁচব না।"

শুনে জন্তুটা কেঁদে ফেল্‌ল। কী আশ্চর্য! তার চোখের জলের ফোঁটাগুলি পদ্মরাগ মণি হয়ে ঝরে পড়ছে। আনন্দে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে সৈনিক কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সেই মণিগুলোকে, আর বলতে লাগল, "আমাকে বাঁচালে, বাঁচালে সামেবিতো।"

কিন্তু গুণে দেখা গেল চোখের জলের মণি দশ হাজার হয় নি। যোদ্ধা বলে, "আবার কাঁদো, আবার কাঁদো।"

"আর তো কাঁদতে পারব না। তুমি মরে যাচ্ছ দেখে দুঃখে আমার ভিতর থেকে চোখের জল আপনি উপচে উঠেছিল। এখন তুমি ভাল হয়ে গিয়েছ, এখন আর আমার দুঃখ নেই। কাঁদব কেমন করে ?"

তখন সৈনিক নিজের বিয়ের কথা, আর মেয়ে কি বলেছে, সব জানাল তাকে। সামেবিতো



কিম্ভূতকিমাকার একটা জীব, জল থেকে বালির উপরে উঠে এল।

খানিক চুপ করে কি ভাবল, তারপর বলল, "তুমি এক কাজ কর! আমাকে সমুদ্রের কিনারে নিয়ে চল। সেখানে আমার পুরনো ঘর দেখে হয়ত আমার কান্না পাবে।"

তাকে নিয়ে যোদ্ধা গেল সমুদ্রের তীরে। নীল সাগরের পানে চেয়ে চেয়ে, সামেবিতোর চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। সেই জল জমে হয়ে গেল রত্নের স্তূপ। সৈনিকের আনন্দ দ্যাখে কে। আরও সুখের ব্যাপার হল যখন সমুদ্রের রাজা লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, তিনি সামেবিতোকে ক্ষমা করেছেন। সে দেশে ফিরে যেতে পারে।

গমের জাহাজ

সাত শ' বছর আগে, হল্যাণ্ড দেশে সমুদ্রের কিনারে এক শহর ছিল। শহরটিকে সমুদ্রের গ্রাস হতে বাঁচাবার জন্য তৈরী হয়েছিল প্রকাণ্ড উঁচু বাঁধ। সেই শহরের বন্দর থেকে জাহাজ ভাসিয়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করে বড়লোক হয়ে গিয়েছিল শহরবাসীরা। তাদের গর্বের সীমা ছিল না। সব চেয়ে অহঙ্কার ছিল এক বণিক মহিলার। একবার তিনি তাঁর মস্ত একটা জাহাজের কাপ্তেনকে ডেকে বলেন, "জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়। পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে মূল্যবান জিনিস যা, তাই আমাকে জাহাজ ভরে এনে দাও"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি চান? রেশমের কাপড়? না সোনা দানা? নাকি হীরে মণি?"

"আমি তোমাকে হুকুম দিয়েছি। কোন্ জিনিস পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, খোঁজ নাও। তারপর সেই বস্তু এনে দাও আমাকে জাহাজ বোঝাই করে।"

কাপ্তেন তখনি জাহাজ ছেড়ে দিল। সমুদ্রে পড়ে, সে তার লোকজনদের ডেকে জানাল মনিব কি চান, তারপর জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের মতে কি জিনিস সব চেয়ে মূল্যবান?"

একজন বলে, "সোনা।"

দ্বিতীয়জন বলে, "না, উৎকৃষ্ট রেশমী কাপড় সব চেয়ে দামী।"

তৃতীয়জন বলে, "আমার মতে, হীরেই সকলের চেয়ে দামী।"

লোকেরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত দেয়। শেষটা তাদের ভিতর সকলের ছোট যে, সে বল্ল, "আমি জানি কিসের দাম সব চেয়ে বেশী। খেতে না পাওয়ার কষ্ট যে কী, তা আমি ভাল করেই বুঝেছি। গমের মত মূল্যবান আর কিছু নেই।"

কাপ্তেন সায় দিলেন তার কথায়, "ঠিক, ঠিক।" তখন খুঁজে খুঁজে যে দেশে উৎকৃষ্ট গম জন্মায়, সেখান থেকে জাহাজ ভর্তি গম নিয়ে ফিরল তারা।

এদিকে, অহঙ্কারী বণিক মহিলা প্রতিবেশীদের বলে বেড়িয়েছেন, "আমার কাপ্তেনকে পাঠিয়েছি, আমার জন্য পৃথিবীর সব চেয়ে দামী জিনিস আনতে।" কাজেই সকলে আগ্রহের সঙ্গে জাহাজের অপেক্ষা ক'রে আছে, কাপ্তেন কি আনে দেখতে।

জাহাজ বন্দরে লাগলে, বণিক মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন কাপ্তেনকে, "এত শীঘ্র ফিরলে কি করে? কি আনলে?"

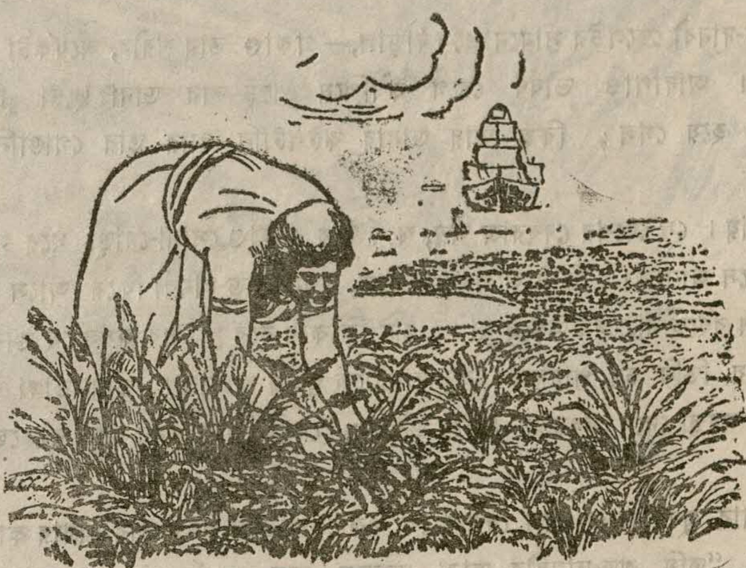
"জাহাজ ভরা সব চেয়ে উৎকৃষ্ট গম", উত্তর হল।

"গম! গম! বলছ কি? আমার হুকুম সব চেয়ে মূল্যবান যা, তাই আনবে। লোকে বলবে কি? ফেলে দাও, ফেলে দাও সমস্ত সমুদ্রের জলে।"

সব গম ঢেলে দেওয়া হল সাগর-গর্ভে। কাপ্তেন রেগে বল্‌লেন মনিবকে, "এর জন্য এক দিন আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।"

তিনি বাড়ি ফিরতে না ফিরতে, আরম্ভ হল তুমুল ঝড়। কত দিন ধরে চল্‌ল বিপর্যয় কাণ্ড। খবর এল, তাঁর সবগুলি বাণিজ্য জাহাজ ডুবে গেছে। এদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ বালির রাশি বয়ে এনে ফেলে, চড়া পড়িয়ে দিয়েছে বন্দরের মুখে। গমের জাহাজখানা চড়ায় ঠেকে গেছে টুকরো টুকরো হয়ে। শহরের বাণিজ্য বন্ধ। লোকের খাওয়া-পরার উপায় বন্ধ।

সব পণ্য নষ্ট হওয়াতে, গরীবের গরীব হয়ে পড়লেন মহিলা। কিছুকাল কাটল ঘরের ধন বিক্রী ক'রে। তার পর আরম্ভ হল ভিক্ষা। কেউ ভিক্ষা দিতে চায় না অহঙ্কারীকে। টিটকারি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তার পর এল একবেলা অনাহার।



মহা আনন্দে সেই গম কেটে নিল সকলে।

এমনি অবস্থায় একদিন সেই চড়া-পড়া বন্দরের কাছ দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, চড়ার উপরে যেন সবুজ গালিচা বিছানো রয়েছে। যে গম তিনি ফেলে দিয়েছিলেন জলে, সেই গম ঝড়-জলের সঙ্গে ভেসে এসে ভিজে বালিতে প'ড়ে অঙ্কুর গজিয়েছে।

যখন গমের গাছ বড় হল, গম পাকল তাতে, তিনি শহরের যত গরীব দুঃখীকে ডেকে এনে বললেন, "নাও তোমরা, যত খুশি গম কেটে নাও।" না খেয়ে খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তারা। মহা আনন্দে সেই গম কেটে নিল সকলে।

ডানা-ভাঙ্গা ঝড়

শান্ত সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়ে আদাপা নামে একটি ছেলে মাছ ধরছে। হো হো ক'রে হাসতে হাসতে ছুটে এসে ঝোড়ো হাওয়া দিল তার মাস্তুলটা মট্ করে ভেঙ্গে, নৌকোখানাকে দিল কাত ক'রে ফেলে। অতি কষ্টে ছেলেটি ডাঙ্গায় এসে উঠল। ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে সে বিমর্ষভাবে চেয়ে আছে ভাঙ্গা নৌকোর দিকে, ঝোড়ো হাওয়া এসে হি-হি-হি-হি ক'রে ঘুরতে লাগল তার চারপাশে, যেন ভারি একটা মজা করেছে।

"যদি তোমায় দেখতে পেতাম, তোমার ডানা দুটো আমি ভেঙ্গে দিতাম।" বলে চেঁচিয়ে উঠল আদাপা।

হঠাৎ ঝড়-দানবী ছেলেটির সামনে এসে দাঁড়াল,—প্রকাণ্ড তার শরীর, অর্ধেকটা মানুষের মত, অর্ধেক পাখির মত। আদাপাও ভীষণ রেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ডানা দুটো দিল মুচড়ে। অমনি দানবী অদৃশ্য হয়ে গেল; কিন্তু তার ডানার ঝটপটানি আর তার গোঙানি শোনা যেতে লাগল তখনও।

দিন যায়। সে দেশের দেবরাজ অনু, স্বর্গে তাঁর প্রকাণ্ড সোনা-মোড়া ঘরে সমস্ত দরজা জানালা খুলে দিয়ে বসে আছেন। তিনি অপেক্ষা করছেন, কখন ঝড়-দানবী ফিরে আসে। তাই তো! কি হল? বাতাস বইছে না, মেঘ উড়ছে না। বৃষ্টি কি করে হবে? সব ফসল যে শুকিয়ে যাবে।

শেষটায় তিনি চর পাঠালেন ঝড়-দানবীকে খুঁজে আনতে। ডানা-ভাঙ্গা ঝড়-দানবী ফিরে এল তার সঙ্গে। অবস্থা দেখে দেবরাজ চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোন্ লোক এমন কাজ করেছে? ধরে নিয়ে এস তাকে।"

আদাপার ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখল, কে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। সেই দেবদূত বলল, "তুমি ঝড়-দানবীর ডানা ভেঙ্গেছ বলে স্বর্গের রাজার আদালতে তোমার ডাক পড়েছে।"

এই দৃশ্য মিলিয়ে যেতেই, আদাপা গিয়ে তার বাবা ইয়াকে জাগাল, বলল, "বাবা এইবার আমাদের দুঃখের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি ঝড়-দানবীর ডানা ভেঙ্গে দিয়েছি, তাই অনু আমাকে তলব করেছেন বিচারের জন্য।"

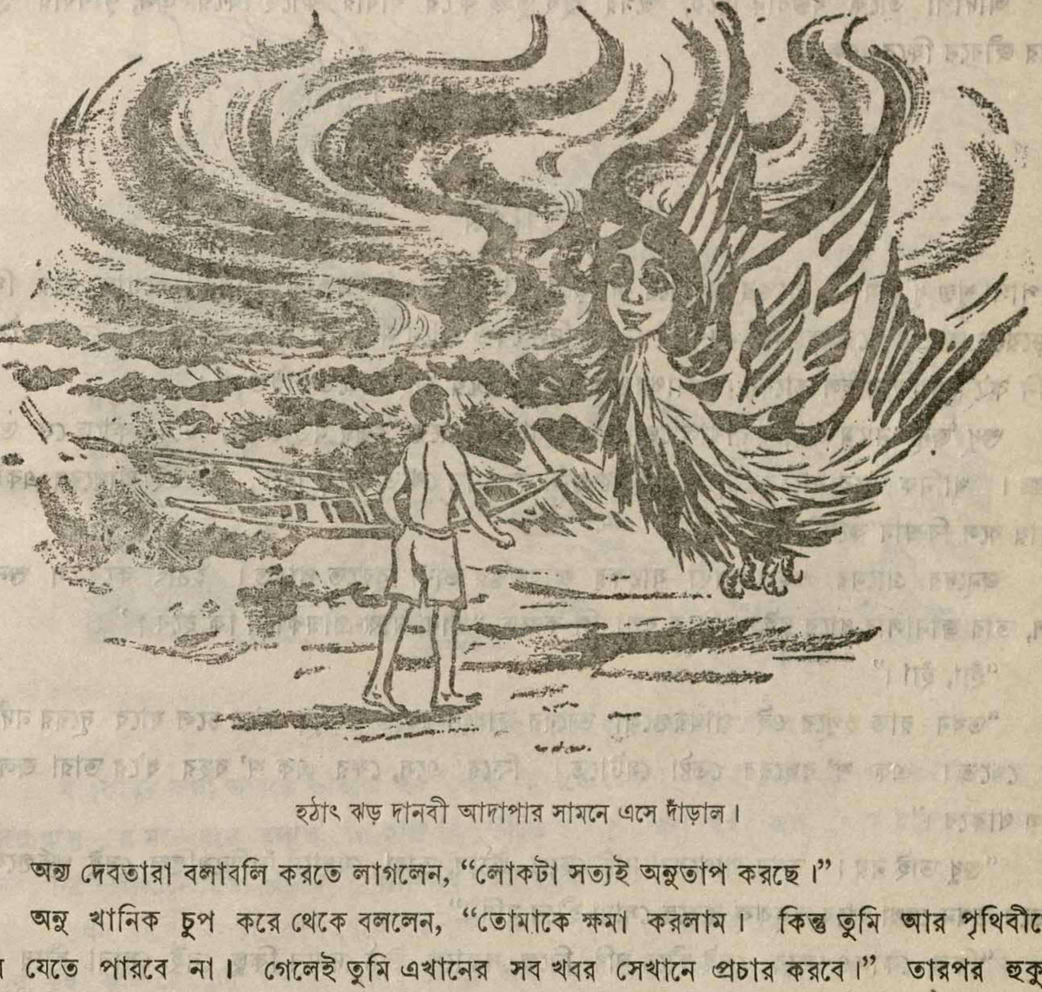
ইয়া মনের দুঃখ চেপে রেখে বললেন, "দীন ভাবে তাঁদের কাছে যাও। তোমার তেজ ছাড়। তাঁদের কাছে ক্ষমা চাও। যদি তাঁরা ক্ষমা করেন, শীঘ্র এখানে ফিরে এস। আর মনে রেখো, সেখানে স্বর্গের খাদ্য কিছু খাবে না। খেলে, পৃথিবীর কথা, আমাদের কথা ভুলে যাবে।"

আদাপা গিয়ে পৌঁছাল স্বর্গের আদালতে। দেবতারা বসে আছেন ঘর আলো করে। অনুর

চেহারা সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আদাপা তাঁর সামনে চোখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসল।

অনু বিষম রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "তোমার এত বড় স্পর্ধা, আমার লোকের গায়ে হাত তোল ?"

আদাপা বিনীত ভাবে উত্তর দিল, "দেবরাজ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। দানবী আমার জাহাজখানা ভেঙ্গে ফেলেছিল, তাই আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল, তার ডানা ভেঙ্গে দিলাম। বাস্তবিক আমি আমার কাজের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত।"



হঠাৎ ঝড় দানবী আদাপার সামনে এসে দাঁড়াল।

অন্য দেবতারা বলাবলি করতে লাগলেন, "লোকটা সত্যই অনুতাপ করছে।"

অনু খানিক চুপ করে থেকে বললেন, "তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু তুমি আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। গেলেই তুমি এখানের সব খবর সেখানে প্রচার করবে।" তারপর হুকুম করলেন, "দাও, ওকে স্বর্গের রুটি এনে দাও খেতে।"

যখন রুটি আনা হল, আদাপা অনুর পায়ের উপরে পড়ে বলতে লাগল, "আপনি মহান, আমি কীটানুকীট। আমার উপর রাগ করবেন না দেবতা। আমায় ক্ষমা করুন, আমি কিছু খাব না।"

অন্নু রাগে ঘর কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠলেন, "আমি দিচ্ছি, তুমি খাবে না ? নরাধম, তুমি কি মনে করেছ আমি বিষ দিচ্ছি ? তোমাকে দেবতাদের খাবার খেতে দিচ্ছি, সেটা বুঝতে পার ?"

"আপনি ধর্মাবতার। মার্জনা করুন আমায়। আসবার সময়ে আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, আপনার মার্জনা পেলেই আমি তাঁর কাছে ফিরে যাব।"

এই শুনে অন্নু নরম হয়ে গেলেন, "যদি পৃথিবীতে ফিরে যাও, তুমি ব্যাধি জরা ও মৃত্যুর মধ্যে ফিরে যাবে। মানুষের জীবনই তাই। তবে, তুমি যখন ইচ্ছা করছ, তখন ফিরেই যাও।"

আদাপা তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে, স্বর্গের সুখ তুচ্ছ ক'রে বাবার কাছে ফিরে এল, পৃথিবীর সুখ-দুঃখের জীবনে ফিরে এল।

পাথর

গাছপালা শূন্য ধূ ধূ মাঠে, বৃত্তের আকারে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলি প্রকাণ্ড পাথর। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তারা। কে তাদের সেখানে রেখে দিল কেউ জানে না। হয়ত বা পুরাকালে কোনও দৈত্য অমনি ক'রে সাজিয়েছিল তাদের। পাথরগুলির কাছে ভয়ে মানুষ যেতে চাইত না।

শুধু 'জন্' নামে একটি রাখাল ছেলে ওই পাথরগুলিকে বন্ধুর মত ছাখে, ওদের কাছে সে ভারি কৃতজ্ঞ। খানিক দূরে মাঠের উপর তার গরুগুলিকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে, সে ওই পাথরের একটার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে, আরাম পায়।

জন্দের গ্রামের এক মায়াবী যাদুকর জীবজন্তুর ভাষা বুঝতে পারত। হঠাৎ কবে সে শুনতে পেল, তার জানালার ধারে দুই পাখিতে বলাবলি করছে, "জান, মাঝ-গ্রীষ্মকালে কি হবে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"তখন রাত দুপুরে ওই পাথরগুলো তাদের জায়গা ছেড়ে হুড়মুড় ক'রে চলে যাবে দূরের নদীতে জল খেতে। এক শ' বছরের তেষ্টা মেটাতে। ফিরে এসে, ফের এক শ' বছর ধ'রে তারা জল না খেয়ে থাকবে।"

"শুধু তাই নয়। তখন পাথরেরা মাটি ছেড়ে উঠবে, তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই গর্তগুলোর ভিতরে তখন দেখা যাবে ঝক্‌ঝক্ করছে সোনা হীরে মণি।"

"কিন্তু কোনও লোক সেই হীরে মণি নিলে, সকালে উঠে দেখবে কিছু নেই, সোনা হীরে হয়ে গেছে ধুলোর রাশি।"

"তবে যদি সে একজন মানুষকে কোনও পাথরের নিচে চাপা দিতে পারে, তাহ'লে তার ধন-রত্ন ধুলো হবে না।"

শুনেই মায়াবী চিন্তা করতে লাগল কাকে চাপা দেওয়া যায়। জনের কথা তার মনে পড়ল, কেননা জনের আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। সে সময়টা গরমকালের মাঝামাঝিই ছিল। যাত্নকর জন্‌কে ডেকে, পাখির কাছে যা শুনেছে বল্‌ল।

আর বল্‌ল, "আজ রাত্রে পাথরগুলোর কাছে আমার সঙ্গে দেখা ক'র।" পাখিদের শেষ কথাগুলো অবশ্য জন্‌কে জানতে দিল না।



জন্ ঐ পাথরের একটার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে।

যাত্নকরের কথা ভাবতে ভাবতে জন্ গোরু চরাতে গেল। তার চেনা বড় পাথরটার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে, সে মনে মনে বল্‌ছে, "এ কাজ কি উচিত হবে? এরা যখন জল খেতে যাবে, তখন এদের ধনরত্ন নিয়ে পালানো তো অন্যায়। আমি এ কাজ করব না।"

তখন পাশের কাঁটা ঝোপ থেকে কে যেন গলা বাড়াল। জন্ ত্যাখে, ছোট এক মজার মানুষ, তার: তুই কান রেঁায়ায় ভরা। মানুষ বল্‌ল, "জন, তুমি উচিত কথাই ভাবছ। কিন্তু আমি জানি, পাথরেরা তোমাকে ভালবাসে। খুশি হয়ে তারা তোমাকে হীরে মণি দেবে, বিশেষতঃ তোমার চেনা পাথর। তবে এক কাজ কর। লম্বা একটা লতা কেটে এনে এই বড় পাথরটার গোড়ায় রেখে দিও, আর কেবল এই পাথরের নীচ থেকে ধনরত্ন নিও। কাউকে ব'ল না এসব কথা।"

মাঝ রাতের একটু আগে জন্ পাথরের বুকের কাছে উপস্থিত হয়েছে। মায়াবী তার আগেই গিয়ে সেখানে ব'সে আছে। ঠিক দুপুর রাতে, হু হু ক'রে বাতাস ছুটল, পৃথিবী কেঁপে উঠল, পাথরগুলো গা মোড়ামুড়ি দিয়ে মাটি ছেড়ে উঠে হুড়দাড় দৌড়ল নদীর পানে। জন্ও ছুটে গেল নির্দিষ্ট পাথরের কাছে।

সেখানে নিচু গর্তের ভিতর সোনা মণি দামী দামী পাথরের রাশি। জন্ লাফিয়ে নামল, দুই পকেট ভ'রে নিল মণি মানিক সোনা। মণি মানিকের আভাতেই গর্ত আলো হয়ে গিয়েছে। মায়াবীও সাতটা থলি নিয়ে নেমেছে আরেক গর্তে।

খানিক বাদে শোনা গেল মেঘের গর্জন, হাতুড়ি পেটাবার মত দমাদম্ শব্দ। পাথরেরা ফিরে আসছে। এতক্ষণে জনের হুঁশ হল, গর্তের খাড়া পাশ লোহার মত শক্ত আর পিছল। উপরে ওঠা অসম্ভব। সে আর যাদুকর গর্তের মধ্যে পাথর চাপা প'ড়ে মরবে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতে, জন্ দ্যাখে, সেই বোঁয়াকানী মানুষ কাটা লতাটা ঝুলিয়ে দিচ্ছে জনের দিকে। সে সেটা ধরতেই মানুষটি তাকে টেনে তুলল উপরে। পাথরও এসে দড়াম্ শব্দে ব'সল নিজের জায়গায়।

মায়াবীকে আর দেখা যায় নি। জনের এখন সুখে আরামে দিন কাটে। কোনও অভাব নেই। সে আজকাল গোরু চরায় না। কিন্তু তবু এখনও সে প্রায়ই এসে পাথরের ছায়ায় বসে, আর তার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়।

বনের পাখি

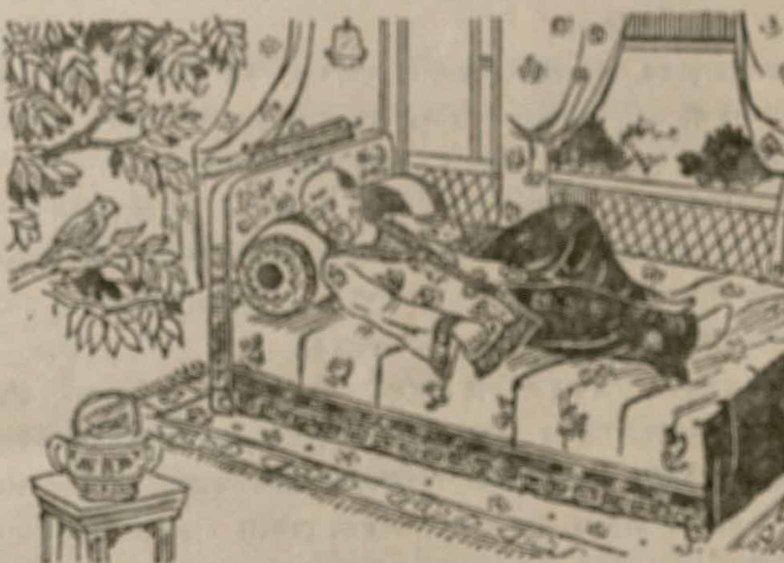
চীন দেশের এক রাজার মস্ত বড় আশ্চর্য প্রাসাদ, আগা-গোড়া চীনে মাটির তৈরি, এত পাতলা তার দেওয়াল যে ছুঁলেই যেন ভেঙে যাবে। প্রাসাদ ঘিরে যে বাগান, সে বাগানের শেষ কোথায় তা মালীরাও জানত না।

বাগান পার হয়ে গেলে পাওয়া যেত—আকাশ-ছোঁয়া গাছের ঘন বন। সেই বনের শেষে নীল জলের হ্রদ। জেলেরা রাত্রে হ্রদের জলে মাছ ধরবার জাল ফেলতে আসত। তারা স্তব্ধ হয়ে শুনত কোথায় এক পাপিয়া পাখি মন-মাতানো গান করছে।

দেশ-দেশান্তর থেকে লোকেরা আসত—রাজার আশ্চর্য বাড়ি আর বাগান দেখতে। কিন্তু তারা যখন পাপিয়ার গান শুনতে পেত, তখন বলত, "এইটাই রাজ্যের সেরা জিনিস। দেশে ফিরে গিয়ে তারা পাখির গানের কথা বলত সবাইকে। শুনে শুনে দেশের বিদ্বান লোকেরা পাপিয়ার গান নিয়ে বই লিখতেন, কবিতা লিখতেন। সেই সব বই চালান হয়ে যেত এদেশে ওদেশে।

এমনি একখানা বই একদিন পড়ল চীনের রাজার হাতে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, "এ কি! আমার রাজ্যের সেরা জিনিস এ পাখি, আমি তো কখনও তাকে দেখি নি, তার গান শুনি নি!" তাঁর দৌবারিককে ডেকে তিনি হুকুম করলেন, "নিয়ে এস পাপিয়াকে খুঁজে। আমি আজই তার গান শুনতে চাই।"

দৌবারিক জানে না পাখির খবর। সে প্রাসাদের এদিকে গেল, ওদিকে গেল, যাকে পেল তাকেই জিজ্ঞাসা করল পাখির কথা, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না।



বনের পাখি চীনের রাজাকে গান শোনাচ্ছে।

অবশেষে, রাঁধুনীদের ছোট্ট একটি গরীব মেয়ে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি খুব ভাল করে তাকে জানি।"

"আমাকে তার কাছে নিয়ে চল তো!"

তারা দুজনে চল্‌ল বনের দিকে। পাত্র মিত্র সবাই চল্‌ল তাদের সঙ্গে সঙ্গে। জঙ্গলে একটা গাছের নীচে পৌঁছে মেয়েটি আঙুল দিয়ে উপরে দেখিয়ে দিল, "ঐ যে পাখি।" সেখানে পাতার মাঝখানে বসেছিল ছোট্ট পাপিয়া।

দৌবারিক হাত জোড় ক'রে পাখিকে বল্‌ল, "আজ রাত্রে রাজবাড়িতে মস্ত ভোজ হবে। সেই সভায় তুমি গিয়ে যদি দয়া করে গান গাও, ভারি খুশি হবেন রাজামশাই।"

রাজা ডেকেছেন তাই পাখি রাজী না হয়ে পারল না। ভোজসভায় তার গান শুনে নিমন্ত্রিত

সকলে, সভাসদ সকলে, রাজামশাই নিজে একেবারে মুগ্ধ। পাখীকে রাজা তাঁর বাড়িতে খাঁচায় রেখে দিলেন, তাঁকে গান শোনাবার জন্য।

এর মধ্যে একদিন রাজামশাইয়ের নামে মস্ত এক মোড়ক এসে পৌঁছোল। মোড়ক খুলতে বেরোল একটা কলের পাপিয়া, সোনা রূপোয় গড়া, তার গা ঢেকে হীরে মণি পান্না চুনি ঝলমল করছে। কল মুড়ে দিতে, নকল পাপিয়া ল্যাজ নেড়ে নেড়ে, আসল পাপিয়ার একটা গানের সুর গেয়ে উঠল। কলের পাখির গলায় একটা ফিতে জড়ানো ছিল, তাতে লেখা ছিল, 'জাপান দেশের রাজার পাপিয়ার কাছে চীনের রাজার পাপিয়া কিছুই নয়।'

যতবারই কল মোড়া হয়, ততবারই কলের পাখি গান গায়, কিন্তু একই সুর গায়। অনেকবার শুনে শুনে রাজামশাই বললেন, "এইবার আমার পাখিকে আন, তার গান শুনি।" কিন্তু কোথায় পাখি ? তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সে উড়ে চলে গেছে তার বনের দেশে।

রাজা ভাবলেন, "যাক্ গিয়ে। আমার কলের পাখিও খুব ভাল। তার চেয়ে ভাল।"

কলের পাখিকে রেশমের বালিশের উপরে রাজার বিছানার পাশে রাখা হল। এমনি করে বছর ঘোরে। রোজ রাত্রে রাজা কলের পাপিয়ার গান শোনেন। এক রাতে তিনি গান শুনছেন যখন, হঠাৎ পাখিটার ভিতরে শব্দ হল—খটাং ; আর গান গেল থেমে।

"কি হল, কি হল ?" রাজামশাই লাফিয়ে নামলেন বিছানা থেকে। "হাকিম ডাক, বদ্যি ডাক।"

কিন্তু হাকিম বদ্যি কলের পাপিয়ার কি করবে ? তখন ডাক পড়ল ঘড়ির কারিগরের। কারিগর এসে কোনও মতে জোড়াতাড়া দিয়ে কলের পাখিটাকে মেরামত করল। কারিগর বলে গেল, "ভিতরের কলকব্জা বাজিয়ে বাজিয়ে ক্ষয়ে গেছে ; অতএব বেশীবার বাজানো চলবে না। বছরে একবার মাত্র বাজাবেন।"

দিন চলে। চীনে দেশে মড়ক এল সেবারে। রাজামশাই অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়লেন। তিনি একলা শুয়ে আছেন খাটে। মৃত্যু তাঁর শিয়রে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন রাজা, "গান চাই, গান। ও পাখি, গান শোনাও আমাকে।" কিন্তু কেউ ছিল না তাঁর কাছে, কলের পাখিতে দম দেবে কে ?

অকস্মাৎ অতি সুন্দর গানের সুরে ঘরের বাতাস ভরে উঠল—বনের পাপিয়া গান গাইছে।

"আহা, আহা", বলে উঠলেন রাজা, "তোমাকে আমি চিনি, ওগো পাখি। আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, তুমি এলে আমার প্রাণ বাঁচাতে। তুমি থাক আবার আমার কাছে।"

"আমি বনের পাখি। বনের গাছে, অবাধ আকাশে আমি গান গাই। ধরা দিতে পারব না। কিন্তু আমি রোজ সন্ধ্যাবেলা আসব, যখন আপনি একলা থাকবেন, আপনাকে গান শোনাব। এখন একটু ঘুমোন, আমি গান গাই। সকালে উঠে সব অসুখ আপনার সেরে যাবে।"

পরদিন সকালে রাজ্য জুড়ে আনন্দ উৎসব লেগে গেল—রাজামশাই ভালো হয়ে গিয়েছেন।

জাপানী আয়না

অনেক অনেক কাল আগে, জাপান দেশে এক গ্রামে, তার মা-বাবার সঙ্গে থাকত মাৎসুয়ামা নামে ছোট্ট একটি মেয়ে। একদিন তার বাবাকে কোনও কাজে অনেক দূর শহরে যেতে হল। মাৎসুয়ামা আর তার মা কেঁদে আকুল। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন মাৎসুয়ামাকে, "বিদেশ থেকে কি আনব তোমার জন্য?"

"শুধু তুমি ফিরে এলেই আমাদের হবে।" বল্‌ল তারা দুজনে।

কত বিপদ, কত দস্যু ডাকাত আছে পথে। ভেবে তারা সারা হয়। ভাবনা ঘোচে, আনন্দে নেচে ওঠে মন সেদিন, যেদিন আবার বাবাকে দেখা যায় পথের মোড়ে। তিনি এসে, তাঁর বাঁশের বাক্স থেকে বের ক'রে একটা মস্ত বড় পুতুল মাৎসুয়ামার হাতে দিলেন। পুতুল হাতে পেয়ে মেয়ে এত খুশি হল যে মায়ের জন্য বাবা কি এনেছেন তা দেখতেই ভুলে গেল।

মায়ের জন্য এসেছিল একখানি হাত-আয়না। তিনি আগে কখনও আয়না দেখেন নি; জিজ্ঞাসা করলেন, "এতে কোন্ মেয়ের ছবি?" তখন আয়নার ব্যাপার বাবা বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে।

কিছুকাল পরে মাৎসুয়ামার মা অসুখ হয়ে মারা গেলেন। মারা যাবার আগে তিনি মেয়েকে অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর তোষকের নীচ থেকে কাপড় জড়ানো একটা কি বের করে দিলেন তার হাতে।

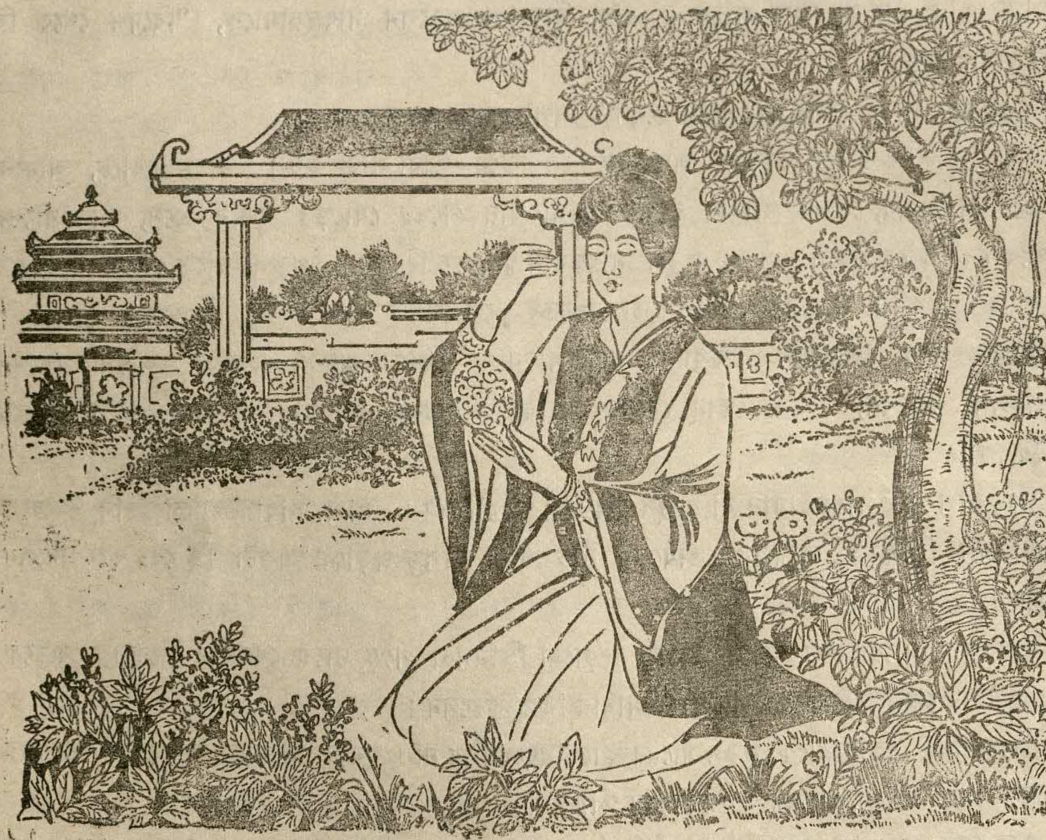
মাৎসুয়ামা মায়ের জন্য কাঁদে, কাপড় জড়ানো জিনিসটা পড়ে থাকে খেলনার বাক্সে। মেয়েকে দেখবার শুনবার কেউ নেই ব'লে তার বাবা আবার বিয়ে করলেন।

মেয়ে একা একাই থাকে, নতুন মায়ের কাছে বড় ঘেঁষে না। নতুন মাও তাকে কেমন সন্দেহের চোখে দেখেন। ভাবেন, মেয়ের ভারি বিদ্বেষ তাঁর উপরে।

কবে যেন, খেলনার বাক্স ঘাঁটতে ঘাঁটতে কাপড়ে জড়ানো জিনিসটা মাৎসুয়ামা তুলে নিয়ে খুলে ফ্যালে। ওমা! তার নিজের মা যে ওর ভিতর থেকে চেয়ে দেখছেন! কিন্তু তাঁকে আরও অল্প বয়সের আরও সুস্থ মনে হচ্ছে। ভারি খুশি হয়ে মেয়ে হেসে ফ্যালে। মাও হাসেন তার দিকে চেয়ে। মাৎসুয়ামার মন শান্ত হয়। সে যখন-তখন কোণায় ঢুকে আয়নাখানা খুলে তার ভিতরে চেয়ে চেয়ে মাকে ছাখে।

তার ভাবভঙ্গি নতুন মায়ের ভাল লাগল না। তিনি মনে করলেন, মাৎসুয়ামা তাঁকে ভালবাসে না, তাই কোণে বসে বসে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু কু-মৎলব আঁটে। তার বাবাকে তিনি সন্দেহের কথা বললেন। বাবা হেসেই উড়িয়ে দিলেন কথাটা।

কিন্তু তিনি যখন মেয়েকে খুঁজে খুঁজে বাগানে গেলেন, আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সে একটা কি জিনিসের উপর একমনে ঝুঁকে রয়েছে। বাবা যেতে, মেয়ে থতমত খেয়ে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে ফ্যালে জিনিসটা। তিনি যখন ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কি ওটা ?" মাৎসুয়ামা আমতা আমতা করে, তার চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তখন তিনি তার হাত ধ'রে এক ঝাঁকানি দিলেন। দিতেই, আয়নাখানি প'ড়ে গেল মাটিতে। মাৎসুয়ামা কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল বাবাকে, তার মা ওটা তাকে দিয়ে-



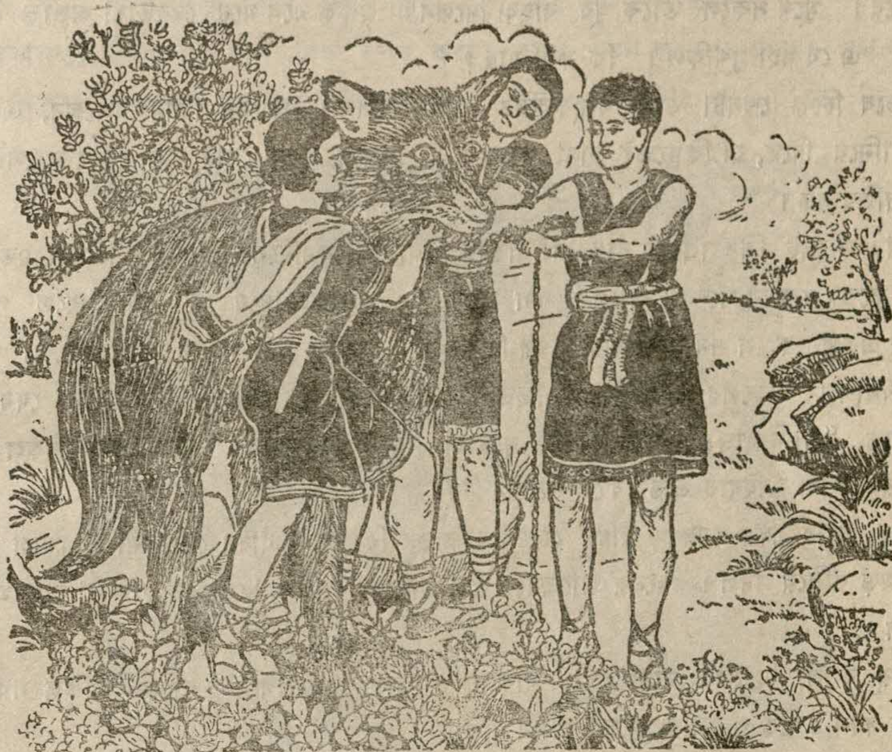
মাৎসুয়ামা আয়নার মধ্যে তার মাকে দেখতে পেল।

ছিলেন, তিনি এর ভিতরে এসে চেয়ে দেখেন, তাই সে ওটাকে যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছে। জিনিসটা হারিয়ে গেলে সে আর তো মাকে দেখতে পাবে না।

সব শুনে বাবার অত্যন্ত অনুতাপ হল ; নতুন মায়েরও মন গ'লে গেল। তাঁরা দুজনে অনেক আদর ক'রে তার কান্না থামালেন। তারপর থেকে ভারি শান্তিতে দিন কাটতে লাগল সেই পরিবারে।

বাঁধন

স্বর্গের রাজা 'ওডিন্' তাঁর প্রাসাদের এক উঁচু চূড়োর উপরে ব'সে ছিলেন, আর চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন, পৃথিবীতে কে কোথায় কি করছে। তাঁর নজরে পড়ল, একটা জঙ্গলের ভিতর তিনটা দানব লুকিয়ে আছে। তাদের একটা হল 'ফেন্‌রিস্' নামে নেকড়ে; আর একটা হল চিতাকাটা দানবী, নাম তার 'হেল্'; তৃতীয়টা এক প্রকাণ্ড সাপ।



ফেন্‌রিস্ রেগে টিরের হাতে কামড় বসিয়ে দিল।

"তাই তো, এরা পৃথিবীর মানুষদের সর্বনাশ তো করতে পারে।" এই ভেবে তিনি তাঁর মেঘের দেশ থেকে নেমে এলেন! দানবদের কাছে গিয়ে তিনি তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন। দানবী হেল্‌কে বললেন, "তুমি গিয়ে পাতালের রাণী হও।" সাপকে বললেন, "তুমি সমুদ্রের রাজা হও।" আর ফেন্‌রিস্‌কে তিনি নিয়ে চললেন সঙ্গে।

ওডিন্ আশা করেছিলেন দেবতাদের আদর-যত্ন পেয়ে নেকড়ে ফেন্‌রিস্ পোষ মানবে। কিন্তু

যত দিন যায়, নেকড়ে ফেন্‌রিস্ আরোই দুর্দান্ত আর হিংস্র হয়ে উঠে। তার শরীরটাও বেড়ে যায় দিনকে দিন। শেষে সে হয়ে গেল প্রকাণ্ড একটা ঘোড়ার মত বড়। দেবতারা দেখলেন একে না বেঁধে ফেললে চলবে না। কিন্তু তার সঙ্গে কি আর তাঁরা এঁটে উঠবেন ? বোধ হয় না। তাই তাঁরা চালাকি খেলবেন ঠিক করলেন। ফেন্‌রিস্‌কে বললেন, "ফেনরিস, ভারী বলবান ব'লে তো তুমি অহঙ্কার কর। এই শিকলটাকে ভাঙ দেখি।"

একটা লোহার শিকল এনে ফেন্‌রিসের দেহে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো হল। এক হ্যাঁচ্‌কায় সে দুই টুকরো ক'রে ফেল্‌ল শিকলটাকে। আরও মোটা শিকল এনে বাঁধা হল তাকে। সেটাও সে দিল টুকরো টুকরো করে। মুখে সকলে তাকে খুব বাহবা দিলেন। কিন্তু মনে মনে দেবতারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ যে মহা মুশকিল। কি করা যায় ?

ভেবে চিন্তে শেষটা ওডিন্ যাদুকরদের শরণ নিলেন। তাদের তিনি বললেন, এমন একটা শিকল বানিয়ে দিতে, যা কিছুতেই ভাঙা যাবে না। শিকল যখন তৈরি হল, দেখতে সেটা হল সরু রেশমের দড়ির মত।

তারপর সেই শিকল দিয়ে বাঁধবার প্রস্তাব করা হল ফেন্‌রিসের কাছে। শিকল এত সরু দেখে দানব নেকড়ের কেমন সন্দেহ লাগে। সে বলে, "ওই শিকল দিয়ে আমাকে বাঁধতে পার, কিন্তু তোমাদের একজনকে সে সময়ে আমার মুখের ভিতর তার হাতের মুঠোটা পুরে রাখতে হবে।"

সর্বনাশ। সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হল। সকলেই চুপ। তখন যুদ্ধের দেবতা 'টির্' এগিয়ে এসে, "আমি রাজী" ব'লে নেকড়ের মুখে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা হল ফেন্‌রিস্‌কে। "এইবার ভাঙ" ব'লে উঠলেন টির্।

যত জোর দেয় নেকড়ে বাঁধন ছেঁড়বার জন্য, কিছুতেই বাঁধন ছেঁড়ে না। রেগে সে টিরের হাতে কামড় বসিয়ে দিল। মনের আক্রোশে সে ভাবতে লাগল, 'এটা ওর হাত না হয়ে মাথা হলেই ভাল ছিল।'

টির্ বল্‌ল, "হাতের মুঠো গেছে, যাক্। যোদ্ধার অমন গিয়েই থাকে। কিন্তু সকলের শত্রু যে, তাকে দমন করতে পারলাম, এতেই আমি খুশি।"

ঔষধি

আদিকালে মানুষরা আর জীবজন্তুরা মিলেমিশে বাস করত। লোকেরা একটু ফাঁকা জায়গায় কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকত। জন্তুরা থাকত জঙ্গলে। ক্রমে, কেমন ক'রে দুজনদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি আরম্ভ হল। হয়ত কোনও মানুষ শীতকালে, তার ছেলেপিলে শীতে কাঁপছে দেখে পাথর আর তীরধনুক নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে একটা জন্তু মেরে আনে। এনে, তার নরম লোমওলা ছাল নিয়ে ছেলেদের পরায়। কেউ হয়ত খিদেয় অস্থির হয়ে, কোনও পাখি কিম্বা হরিণ মেরে এনে খেয়ে ফেলে।

জীবজন্তুরা শেষকালে সভা ডেকে বিচার করতে বসল কেমন ক'রে মানুষদের জব্দ করতে পারা যায়। মানুষরা সিংহ বাঘ হাতীকে পর্যন্ত কাবু ক'রে ফ্যালে; হরিণের চামড়া দিয়ে নিজেদের নেড়া



জীবজন্তুদের মন্ত্রণা-সভা

শরীর ঢাকে। জন্তুরা তীরধনুক বানাতে জানে না, কিন্তু জন্তুদের হাতেও অস্ত্র আছে। প্রাণীজগতে এমন জীব আছে, যারা মানুষের শরীরে ঢুকে ব্যারাম সৃষ্টি করতে পারে। এদেরই কাজে লাগাতে হবে। তখন থেকে হল অসুখের সূত্রপাত। হাম বসন্ত গেঁটেবাতে মানুষদের দেশ ছেয়ে গেল। সবংশে মরে বুঝি।

এখন হয়েছে কি, জীবজন্তুর মন্ত্রণা-সভার কাছে এক বন্য লতা ঝুলছিল। মন্ত্রণা-সভায় মানুষ-মারবার ফন্দি সে কান পেতে শুনছিল। সে গুড়গুড়িয়ে গিয়ে বড় 'ওক্' গাছকে বলে এই খবর। ওক্ গাছ ফিস্ ফিস্ করে বলে বাতাসকে। বাতাস গিয়ে বলে ঘাসদের শরবনদের। এমনি ক'রে গাছগাছালির রাজ্যে ছড়িয়ে গেল খবরটা। শুনে তারাও ডাকল সভা।

গভীর জঙ্গলে গাছের জটলায় সভা বসেছে। লম্বা 'বীচ' গাছ বল্ল, "এই ভাবে মানুষদের মেরে ফেলা অত্যন্ত অন্যায়। তাদের কত বুদ্ধি। নিশ্চয় তারা একদিন ঐ সব বড় বড় জানোয়ারদের চেয়ে ঢের শক্তিশালী হয়ে যাবে।"

ছোট্ট বুনো ফুল বল্ল, "আহা, মানুষদের ছোট ছেলেমেয়েগুলি কি সুন্দর! যেন ফুলের কুঁড়িটি। চল, আমরা তাদের বাঁচাতে চেষ্টা করি।"

সব গাছের সব পাতা খস্‌খস্ ক'রে সায় দিয়ে উঠল বুনো ফুলের প্রস্তাবে। কেবল বিষ-কাঁটালি আর দু-একটা বিষ গাছ ভ্রূকুটি ক'রে রইল। বিছুটি ঝাঁজালো গলায় বলে উঠল, "আসুক না তারা, আমাকে ছুঁক না। ফোস্‌কা পড়িয়ে দেব তাদের চামড়ায়।" অমনি এক ছোট গাছ বল্ল, "আর আমি সেই ফোস্‌কা সারিয়ে দেব; জ্বলুনি দূর করব।"

গাছগাছালিরা মিলে ভাবতে ব'সে গেল, মানুষদের বাঁচাতে, কোন্ অসুখের জন্য কে কোন্ ওষুধ তৈরি করতে পারে। সেই হতে অসুখে ব্যারামে মানুষ এদের কাছ থেকে কত ওষুধ যে পায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এদেরই আমরা বলি ঔষধি।

যারা লোহা খায়

এক সওদাগর তার সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রী ক'রে কতগুলি লোহার ডাণ্ডা কিনল, এই ভেবে যে, লোহার ডাণ্ডা সব চেয়ে নিরাপদে থাকবে, উই এগুলি কাটবে না, বা চোরে বয়ে নিয়ে যাবে না। তারপর সে লোহার ডাণ্ডাগুলি এক বন্ধুর জিম্মায় রেখে, বেরিয়ে পড়ল আবার দেশ ঘুরতে।

ফিরে এসে, সে বন্ধুর কাছে গিয়ে ডাণ্ডাগুলি চাইতে, বন্ধু বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার লোহার ডাণ্ডা আমি ঘরে তালা দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু, কি বলব, ইঁদুরে সব ডাণ্ডা খেয়ে শেষ করেছে।" সওদাগর আর কি করবে। বন্ধুর উপর বড় অভিমান হল তার।

সেই বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে, সওদাগরের নজরে পড়ল, বন্ধুর ছোট্ট ছেলেটি বাইরে খেলা করছে। সে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে পালালো। কেউ জানতে পারলো না।

এদিকে, সন্ধ্যাবেলা ছেলের বাপ পাগলের মতো রাস্তায় ছুটোছুটি করছে। সওদাগরের সঙ্গে দেখা হতে, বাপ চেঁচিয়ে উঠল, "আমার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

সওদাগর বল্‌ল, "তাই নাকি? আমি দেখলাম একটা পেঁচা একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে



সওদাগর বন্ধুর ছোট্ট ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে পালাল।

উড়ে পালাচ্ছে। সে নিশ্চয়ই তোমার ছেলে। এ কী দেশ রে বাবা! এখানে পেঁচার মতো ছোট পাখি আস্ত ছেলে ধ'রে নিয়ে যায়! ইঁদুরে লোহা খেয়ে ফ্যালে!"

তখন বন্ধু তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে সওদাগরের লোহার ডাণ্ডাগুলি তার কাছে ফিরিয়ে দিল, আর নিজের ছেলেটিকে চেয়ে পাঠালো।

সকলের অপেক্ষা ভাল জিনিস

যখন কাশীর বুড়ো রাজা মারা গেলেন, তাঁর সেনাপতি অন্যায় ক'রে রাজ্য দখল করে নিল। রাজার তিন ছেলেকে সে তাড়িয়ে দিল দেশ থেকে।

তিন রাজপুত্র অনেক পাহাড় পর্বত পার হয়ে, উপস্থিত হল এক মরুভূমির প্রান্তে। সেখানে রাস্তাটা তিন ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে গেছে। পথের ধারে একটা সরাইখানা দেখে, তিন ভাই রাত্রি কাটাবার জন্য সেখানে গেল। কিন্তু রাত্রে তাদের ঘুম হল না। সারারাত জেগে তারা পরামর্শ করতে লাগল কেমন করে বাবার রাজ্য আবার ফিরে পাওয়া যেতে পারে।

ভোর বেলা সবার বড় ভাই, রাজপুত্র দেব জিজ্ঞাসা করল, "বল তো, পৃথিবীতে সব চেয়ে ভাল জিনিস কি?"

সরাইওলার মেয়ে তখন তাদের খাবার পরিবেশন করতে এসেছিল। ছোট ভাই আনন্দ তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, "কি জানি।"

মেজ ভাই শঙ্কু বলল, "শক্তিই সকলের সেরা জিনিস। সেনাপতির হাতে রাজ্যের সমস্ত শক্তি ছিল বলেই তো সে আমাদের রাজ্য কেড়ে নিতে পারল।"

দেব বল্‌ল, "না। ধনই হল সব চেয়ে ভাল। দুষ্ট সেনাপতি, সৈন্যদের ঘুষ দিয়ে বশ ক'রে তবে রাজ্য জয় করেছিল।"

বড় দুভাই এই নিয়ে খানিক তর্ক করল। ছোট ভাই তর্কে যোগ দিল না। খাওয়া শেষ হলে সরাইওলার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে, তিন ভাই বেরোল মরুভূমির পথে। দেব বল্‌ল, "আমি চীন দেশে যাব। সেখান থেকে ধনের ক্ষমতা অর্জন ক'রে নিয়ে আসব।"

শঙ্কু বল্‌ল, "আমি যাব পশ্চিম দিকে, তুর্কিস্থানে। সেখান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আনব। আনন্দ যাক্ শ্যাম দেশে, কিম্বা তার যেখানে ইচ্ছা।"

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, "আবার আমরা একসঙ্গে হব কবে?"

"দশ বছর পরে, বসন্ত কালে, ঠিক এই জায়গায় আমরা মিলব। তখন দেখব কে সব চেয়ে ভাল জিনিস পেয়েছে। তিন জনে উত্তম বস্তু উপার্জন করে আনলে, নিশ্চয় আমরা আবার রাজ্য জিতে নিতে পারব।"

এই পরামর্শ ঠিক ক'রে, তিন ভাই বিদায় নিল। বড় ভাই দেব ঘোড়ায় চ'ড়ে চলে গেল কয়েকজন চীনদেশীয় সওদাগরের সঙ্গে। মেজ ভাই শঙ্কু, মরুভূমি পার হয়ে চল্‌ল তুর্কিস্থানের দিকে। ক্রমে মরুভূমির শেষে সে মিলিয়ে গেল। দেব ও সওদাগরের দলও অনেক দূরে চলে গেল, আর তাদের দেখা গেল না।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাদাদের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ছোট ভাই আনন্দর চোখ জলে ভ'রে এল। তারপর বিষণ্ণ মনে সে চল্‌ল শ্যাম দেশের দিকে।

দশ বছর কেটে গেছে। সবে বসন্ত কাল পড়েছে। পথের পাশের সেই ছোট সরাইখানাটি যেন আরও সুন্দর হয়েছে। তারা গা বেয়ে যে গোলাপের লতা উঠেছে, অজস্র ফুল ফুটেছে তাতে। সেই গোলাপ ফুলের মাঝে, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সরাইওলার সুশ্রী মেয়ে সাকী। তার কোলে একটি শিশু। পাশে, তার আঁচল ধ'রে দাঁড়িয়ে আর দুটি ছোট ছেলে। তারা উৎসুক নয়নে তাকিয়ে আছে মরুভূমির হলদে বালির দিকে।



দেব ও শম্ভু—দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরল।

দুটো প্রকাণ্ড সৈন্যদল যেন মরুভূমি পার হয়ে তাদের দিকে আসছে। এক দল আসছে পূর্ব থেকে, অন্য দল পশ্চিম থেকে।

ক্রমে বোঝা গেল, চীন দেশের পথ দিয়ে আসছে হাতী ঘোড়া আর নীল পোশাক পরা মানুষের লম্বা সারি। সকলের সামনে একটা প্রকাণ্ড হাতী, তার পিঠে সোনার হাওদা মণিমুক্তোয় ঝলমল করছে। হাওদার ভিতরে বসে আছে একজন বুড়ো মতো লোক।

তুর্কিস্থান থেকে আসছিল বিরাট এক সৈন্যদল। তারা সব তুর্কী। তারা ঘোড়ায় চড়ে

আসছিল। হাতে তাদের তীর ধনুক বল্লম। জ্বলজ্বল করছিল তাদের হিংস্র চোখগুলো। সেই সৈন্যদলের ভিতর থেকে একজন বলিষ্ঠ অশ্বারোহী বেরিয়ে এল। তার গায়ে লোহার বর্ম, মাথায় লোহার টুপী।

হাতীর হাওদার উপরের লোকটিকে দেখে, ঘোড়ায় চড়া এই যোদ্ধা চেঁচিয়ে উঠল, "দেব দাদা!" "শঙ্কু!" ব'লে দেব হাতী থেকে নামল। সরাইখানার দরজায় নেমে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরল।

"দাদা, তুমি এমন বুড়ো হয়ে পড়েছ?"

'দশ বছর ধরে আমি দিন রাত খেটেছি। কিন্তু সেজন্য আমার দুঃখ নেই। আজ আমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ধনীদের একজন। এই এত ঘোড়া আর উটের পিঠে বোঝাই কেবল সোনা রূপো মণি মুক্তো।"

"হ্যাঁ, তুমি খুবই ধনী হয়েছ বটে। কিন্তু তুমি কি এখনও মনে কর, ধনই পৃথিবীর সব চেয়ে ভাল জিনিস? আমার এই সৈন্যদল ত্থাখ। দশ বছর ধ'রে অনেক যুদ্ধ ক'রে অনেক কষ্ট ক'রে আমি এদের যোগাড় করেছি।"

"কিন্তু এই এক লক্ষ লোককে তুমি মাইনে দেবে কি ক'রে?" দেব বল্‌ল, "আমি বলছি ধনই শ্রেষ্ঠ। আমি যদি তোমার সৈন্যদের তোমার চেয়ে বেশী টাকা দেবার লোভ দেখাই, এখনি ওরা আমার দিকে চলে আসবে।"

"ভুল বলছ। আমার হাতের এই ভেরী যদি আমি বাজাই, আর ওদের হুকুম করি, ওরা তোমার সমস্ত ধনরত্ন কেড়ে নেবে। সব আমার হবে।"

দেবের মুখ কালো হয়ে গেল। সে বল্‌ল, "তা ঠিকই বলেছ। আচ্ছা আনন্দ কোথায়? কোন্ জিনিসকে সে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করছে কে জানে।"

"ওটা বোকা, কোনও কাজের নয়। তুমি পেয়েছ ধন, আমি পেয়েছি শক্তি। আর ভাবনা কি আমাদের?"

এই সময়ে একটি যুবক হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল সরাইখানা থেকে। তার পোশাক সাধারণ, সাদাসিধা।

"ও, এ যে আনন্দ!" বলে উঠল দেব, "তুমি তো ভাই কোনও ভাল জিনিস পেয়েছ ব'লে মনে হচ্ছে না।"

দাদাদের প্রণাম করল আনন্দ, তারপর উত্তর করল হাসতে হাসতে, "কিন্তু আমি পেয়েছি দাদা। আমি শ্যাম দেশে না গিয়ে, ফিরে এলাম এইখানে। সেই থেকে আমি এখানেই আছি। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আমার স্ত্রী সাকী, আর আমার তিন ছেলে।"

"যেমন বোকা তুই, সেই রকম কাজ করেছিস্। মনে করেছিস্ বুঝি ঘরসংসার পাতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।"

"ঠিক তাই নয়। ঘরসংসার করা খুবই ভাল নিশ্চয়। কিন্তু আমি এখানে এমন একটি জিনিস পেয়েছি, যেটা না থাকলে প্রেম বল, ধন বল, শক্তি বল, কোনটারই কোনও মূল্য থাকে না।"

"সেটা কি জিনিস?" দাদারা জিজ্ঞাসা করল।

"সেটা হল সন্তোষ।" বল্‌ল আনন্দ।

দাদারা খানিক চুপ করে রইল, এ ওর দিকে তাকাল, দুজনের লোকজন ধন-সম্পত্তির দিকে তাকাল, তারপর গেল যেখানে আনন্দর স্ত্রী আর ছেলেরা দাঁড়িয়ে ছিল, সেইখানে।

হঠাৎ দেব শঙ্কুর হাত চেপে ধ'রে চেঁচিয়ে উঠল, "ঠিক বলেছ আনন্দ, ঠিক বলেছ। জান শঙ্কু, আমার এত ধন নিয়েও আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমি মনে মনে চক্রান্ত করছিলাম, তোমার সৈন্যদের ঘুষ দিয়ে, তোমার শক্তি কেড়ে নেব।"

"আর আমিও ঠিক করেছিলাম, তোমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি কেড়ে নেব।"

আনন্দ বল্‌ল, "কেন যে তোমরা দুজনকে ঠকাবার চেষ্টা করছিলে বুঝতে পারি না।"

দেব—"বাবার রাজ্য ফিরিয়ে নেবার জন্য আমার সৈন্য দরকার।"

শঙ্কু—"আমার টাকা চাই। সৈন্যদের বেতন দেব। তারপর তাদের নিয়ে, দুষ্টু সেনাপতিকে রাজ্য থেকে তাড়াব।"

আনন্দ—"সেনাপতি? সে তো ন' বচ্ছর হল ম'রে গেছে। সেই থেকে কতবার যে লোক এসেছে আমাকে ডাকতে। রাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজা হতে। কিন্তু আমি যেতে চাই নি।"

তখন দেব আর শঙ্কু দুজনে 'হো 'হো' ক'রে ভয়ানক হেসে উঠল। তবে তো বৃথাই তারা এতদিন এত পরিশ্রম করেছে। শেষকালে, অনেক ধনরত্ন দিয়ে তারা তুর্কী সৈন্যদের তাদের দেশে ফিরে যেতে রাজী করাল। দেব রাজ্যে ফিরে যেতে চাইল না। সে বল্‌ল, "আমি এখানে আনন্দর কাছে সন্তুষ্ট হয়ে থাকব। মনে শান্তি পাব।"

কাজেই শঙ্কু গেল বাবার রাজ্যে, আর সেখানে খুব ভাল ভাবে রাজত্ব করতে লাগল। কিন্তু সেও মনে মনে স্বীকার করত, আনন্দই পৃথিবীর সব চেয়ে ভাল জিনিস পেয়েছে।

আগুনের ভিতরে সাপ

একজন লোক উটের পিঠে চ'ড়ে যেতে যেতে দেখতে পেল, একটা ঝোপে আগুন লেগেছে, আর ঝোপের ভিতর থেকে কে যেন তাকে বাঁচাবার জন্য করুণ স্বরে ডাকছে। উট থেকে নেমে কাছে গিয়ে ছাখে, একটা সাপের চারদিক ঘিরে আগুন জ্বলছে। লোকটি তখন তার টাকার থলি খালি করল, হাতের বল্লমের ডগায় থলিটা বাঁধল, তারপর ঢুকিয়ে দিল বল্লমটা জ্বলন্ত ঝোপের ভিতরে। সাপ তাড়াতাড়ি লাফিয়ে পড়ল থলিতে। লোকটি অমনি বল্লমটা টেনে বাইরে আনল। সাপ বেঁচে গেল।



বল্লমের ডগায় থলিটা বেঁধে ঢুকিয়ে দিল জ্বলন্ত ঝোপের ভিতরে।

সাপটা থলি থেকে বেরিয়ে আসতে, লোকটি বল্ল, "আমি ধন্যবাদ চাই না। কিন্তু আমি যে তোমার উপকার করলাম, তার বদলে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আর মানুষদের কামড়াবে না। মানুষরা উপকার পেলে, ফিরে উপকার করে।"

সাপ বলে, "প্রতিজ্ঞা করব তো না-ই, বরং এখনি আমি তোমাকে এবং তোমার উটকে কামড়াব। উপকার করলে, মানুষরা ফিরে অপকার করে।"

সাপটা ছোবল মারতে যাচ্ছে দেখে লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "না না, মানুষ দয়া পেলে দয়া করে। চল, কাউকে সাক্ষী মানি, সে যা বলবে সেই মত কাজ হবে।"

"রাজী", বল্ল সাপ। তারা বেরোল সাক্ষী খুঁজতে।

প্রথমেই দেখা হল এক গোরুর সঙ্গে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে গোরু বল্ল, "উপকার করলে, মানুষ অপকারই ক'রে থাকে। এই ছাখ না, কত দিন ধ'রে আমি আমার মনিবকে দুধ মাখন যুগিয়েছি,

আর এখন কিনা সে আমার ছুটো বাছুরকে কশাই-এর কাছে বিক্রী করে দিয়েছে। আমাকে খাইয়ে মোটা করছে একই উদ্দেশ্যে।"

সাপটা লোকের দিকে তাকাল। লোকে বলল, "একজনের সাক্ষীতে হয় না। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করা যাক।"

"আচ্ছা বেশ।"

কাছে একটা গাছ ছিল। গাছকে তারা জিজ্ঞাসা করল। গাছও বলে, "উপকার করলে মানুষ সব সময়ে ক্ষতি করে। আমরা তাদের ফল যোগাই, ছায়া দিই, তবু তারা আমাদের উপ্‌ড়ে ফ্যালে, কেটে উনুন জ্বালায়।"

"কেমন, হ'ল তো?" হাসতে হাসতে বল্‌ল সাপ। মানুষ মিনতি করে উত্তর দিল, "আর একজনকে জিজ্ঞাসা করতে দাও।"

সাপ রাজী হয়ে গেল। কেননা সে জানে সবাই এক কথা বলবে।

তারপর দেখা হল তাদের এক শেয়ালের সঙ্গে। সাপ তাকে ঘটনাটা বুঝিয়ে দিল। শেয়ালটা কটমট করে সাপের দিকে চেয়ে জবাব দিল, "তুমি কি বলতে চাও তুমি ওই ছোট্ট থলিটার মধ্যে ছিলে? আমি বিশ্বাস করি না।"

এই শুনে সাপটা চেঁচিয়ে উঠল, "নিজের চোখেই ছাখ। খোলো থলিটা।"

থলি খুলতেই সাপ তার ভিতরে লাফিয়ে ঢুকল। শেয়াল চোখ টিপ্‌ল, অমনি লোকটি থলির মুখ বেঁধে ফেল্‌ল। শেয়াল বল্‌ল, "স্বভাব-দোষ যাবে কোথায়?"

পীপো

পীপো নামে একটি ছোট্ট মানুষ ছিল। সে একলা থাকত বনের ধারে ছোট একটা ঘরে। সে ছিল ভারি কুঁড়ে আর নোংরা। তার ঘরে ঝাঁট পড়ত না, বাসন ভাল ক'রে মাজা হ'ত না, জিনিসপত্র থাকত অগোছালো। একদিন একজন পরী এলেন পীপোর বাড়িতে। ঘর দেখে তিনি বললেন, "ছি ছি, পীপো, তুমি এমন নোংরা! আমি এ ঘরে ঢুকতে চাই না।" ব'লে চলে গেলেন তিনি।

পীপোর ভারি লজ্জা হল। সে ঠিক করল ঘর দোর আর নোংরা রাখবে না, পরিষ্কার করবে। তার ঝাঁটা ছিল না, তাই সে বাজারে গেল ঝাঁটা কিনতে। বাজারে যেতে হলে, একটা বন পার হতে হয়। সেই বনের পথে চলতে চলতে, পীপো একটা বাড়ির কাছে এল। জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মেরে ছাখে, একজন বুড়ী বসে আছে আর তার সামনে খুব বড় একটা ঝাঁটা দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ী ঝাঁটাকে বলছে, "তুমি ঘর ছুয়ার সব ঝাঁট দাও, আমি সেই সময়টা একটু ঘুমাই।" বুড়ী ঘুমিয়ে

পড়ল, ঝাঁটা নিজে ঘর দুয়ার ঝাড়তে লাগল। পীপো মনে মনে বলল, "আহা, আমি যদি এমন একখানা ঝাঁটা পেতাম!"

বাজারে কোথাও পীপো ঝাঁটা কিনতে পেল না। ফিরবার পথে যখন সে বুড়ীর সামনে দিয়ে আসছে, তখন ঝাঁটা সব ঝাঁটপাট শেষ ক'রে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। পীপো জানালা দিয়ে চুপি চুপি হাত গলিয়ে ঝাঁটাটা বের ক'রে নিয়ে এল। সে ভাবল, "আমার কাজ শেষ ক'রে এখনি যদি এটাকে ফিরিয়ে দিই, তবে হয়ত বুড়ীর কিছু অসুবিধা হবে না।"

ঘরে পৌঁছে পীপো বল্‌ল ঝাঁটাকে, "ঝাঁটা তুমি ঘর ঝাড়, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।" ঠিক যেমনি বুড়ী বলেছিল। অমনি ঝাঁট দিতে আরম্ভ করল ঝাঁটা।

পীপোর ঘুম আসছে না; সে অবাক হয়ে দেখছে, কেমন ক'রে সেটা ঘর দুয়ার ছাত দেয়াল সব ঝাড়ছে। ঝাড়া শেষ হলে, পীপো বল্‌ল, "এখন থাম।" কি মুশকিল, ঝাঁটা তো থামে না! সে বাসন কোসন ঝাঁট দিয়ে এক পাশে জড়ো ক'রে, মাদুর বিছানা ঠেলতে লাগল। তাই দেখে পীপো ধড়মড়িয়ে উঠে চ্যাচাতে লাগল, "আরে আরে, কর কি? থাম না কেন?"

কার কথা কে শোনে? মাদুর বিছানা ঘরের কোণে গাদা করে দিয়ে, পীপোর দিকে এগিয়ে এল সেই দারুণ ঝাঁটা। পীপো যেমনি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যাবে, অমনি ঝাঁটা তার ডাণ্ডিটা ভয়ানক জোরে ঠাঁই ক'রে মেরে দিল পীপোর হাতে। তারপর হুস্ করে তাকে ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দিল দরজার বাইরে। বেরিয়েই পীপো উঠে দিল দৌড়। ঝাঁটাও দৌড়াল তার পিছনে পিছনে।


ঝাঁটাও দৌড়াল পীপোর পিছনে পিছনে

ছুটতে ছুটতে তারা একেবারে বুড়ীর সামনে গিয়ে হাজির। পীপো চ্যাচাতে চ্যাচাতে চলেছে, "বুড়ীমা ও বুড়ীমা, শীগ্‌গির ঝাঁটাকে থামাও।"

বুড়ী দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। পীপোকে পাঁই পাঁই ছুটে আসতে দেখে, আর তার পিছনে ঝাঁটাকে ছুটতে দেখে, হাসতে হাসতে বুড়ীর পেটে খিল ধরবার যোগাড়। সে বল্‌ল, "যেমন না ব'লে

ঝাঁটা নিয়েছিলে, তেমনি সাজা হয়েছে।" তারপর সে ঝাঁটাকে ডাকল, "ঝাঁটা, এদিকে এসো।" ঝাঁটাও ভালমানুষের মত গিয়ে দাঁড়াল বুড়ীর পাশে।

তখন বুড়ী বল্‌ল পীপোকে, "যদি তুমি আর ওরকম কুঁড়েমি না কর, যদি ঘর নোংরা না রাখো তবে তোমার যখন দরকার হবে, তোমাকে ঝাঁটাটা ধার দেব।" পীপোও প্রতিজ্ঞা করল, আর কখনও না ব'লে পরের জিনিস নেবে না।

পথের পাথর

এক দেশের অধিবাসীরা ছিল ভারি কুঁড়ে। কোনও অসুবিধা কি মুশকিল উপস্থিত হলে, সে অসুবিধা দূর করতে কেউ তারা এগিয়ে আসত না, সবাই ভাবত আর কেউ এসে অসুবিধা দূর করবে। তাদের রাজা যিনি, তিনি ছিলেন খুব ভাল লোক। রাজ্যের মঙ্গল, প্রজাদের ভাল-মন্দর প্রতি খুব নজর ছিল তাঁর। প্রজাদের কুঁড়েমি দেখে দেখে তাঁর মনে হল, এ রকম চললে প্রজারা একেবারে নিষ্কর্মা হয়ে পড়বে। এদের একটু না শেখালে চলছে না।

রাজধানীতে ঢুকবার যে সব পথ ছিল তার একটা ছিল দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। এক রাত্রে, রাজামশাই সেই সরু পথে একলা গিয়ে, পথের মাঝখানে একটা গর্ত খুঁড়লেন; খুঁড়ে, একটা থলি সেই গর্তের ভিতরে রাখলেন। তারপর তিনি এক মস্ত পাথর গড়িয়ে এনে গর্তের মুখে বসিয়ে দিলেন। কেউ জানতে পারল না তিনি কি করলেন।

পরদিন সকালে একজন চাষা গোরুর গাড়ি নিয়ে সেই সরু রাস্তায় এল। রাস্তার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পাথর দেখে সে বল্‌ল, "এ দেশের লোকেরা কি কুঁড়ে! এত বড় পাথরটা পথ আটকিয়ে রয়েছে, কেউ এটাকে সরায় নি!" সে পাথরের পাশ কাটিয়ে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে কোনও-মতে গাড়ি পার করল।

খানিকটা বাদে আরেকজন লোক এল। অন্যমনস্ক হয়ে গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে আসছিল, পথের দিকে নজর দেয়নি, হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ল মাটিতে, পা-টা গেল ছড়ে। উঠে রেগে-মেগে সে বলতে লাগল, "দেশের লোকগুলো গোল্লায় গ্যাছে। এমন কুঁড়ে হয়েছে যে এত বড় পাথরখানা রাস্তার মাঝখানে রয়েছে, কেউ এটা সরাবার চেষ্টা করে নি।" এই ব'লে পাথরটা না সরিয়ে সে চল্‌ল নিজের পথে।

একটু পরেই একদল ব্যাপারী ঘোড়া বোঝাই মালপত্র নিয়ে এসে হাজির। প্রকাণ্ড পাথরটা দেখে তাদের একজন বল্‌ল, "বলিহারি, কি দেশ! পথ বন্ধ করে পড়ে আছে মস্ত পাথর। কেমন ক'রে এরা যায় আসে এ পথে!" তারা সে দেশের কুঁড়ে লোকদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই মন্তব্য করল,

কিন্তু নিজেরা চেষ্টা করল না পাথরখানা সরিয়ে দিতে। ঘোড়া নিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে অনেক কষ্টে পাথরের এ-পাশ ও-পাশ ঘুরে তারা চলে গেল।

পাথর সেখানে পড়েই আছে, কেউ সেটা সরাল না। এ ওকে দোষ দেয়, ও একে দোষ দেয়। রাজামশাই নজর রেখেছেন। যখন একমাস কেটে গেল এমনি ভাবে, তখন তিনি ঢোল পিটিয়ে দিলেন যে, রাজ্যের লোকেরা সকলে যেন অমুক দিন ওই সরু রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

নির্দিষ্ট দিনে সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। রাজামশাই এলেন। তিনি বললেন, "দেখ, এই পাথর পথের মাঝখানে আমিই রেখেছিলাম। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, এক মাস ধ'রে তোমরা



পাথরের পাশ কাটিয়ে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে কোনও মতে গাড়ি পার করল।

এ পথে কষ্ট ক'রে যাওয়া আসা করছ তবু কেউই এটাকে সরাও নি। তোমাদের কি ক্ষতি হয়েছে দেখ।" এই ব'লে, তিনি পাথরটা সরিয়ে তার তলার গর্ত থেকে থলিটি বের করলেন। থলির গায়ে একটা কাগজ আঁটা, তাতে লেখা রয়েছে, 'যে পাথর সরাবে, এ থলি তার হবে।' তারপর তিনি থলির মুখ খুলে উপুড় করলেন; তার ভিতর থেকে এক রাশ মোহর মাটিতে ঝন্‌ঝন্ করে পড়ল!

তখন আর আফসোস করে লাভ নেই। তবে সেই থেকে প্রজারা শিক্ষা পেল। তারা আর কুঁড়েমি করত না, যা করবার তখন তখন নিজেরাই ক'রে ফেলত, অন্যের অপেক্ষায় থাকত না।

দেবধর্ম

বৌদ্ধ জাতকের গল্পে আছে, বুদ্ধদেব একবার বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের ঘরে জন্মেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল মহিংসাস কুমার। তিনি তিন-চার বছরের হলে, তাঁর আর একটি ভাই জন্মাল। ভাইয়ের নাম রাখা হল চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমার একটু বড় হতে, রাণী মারা গেলেন। রাজা তখন আবার বিয়ে করলেন।

নতুন রাণীর যখন ছেলে হল, রাজা ছেলের নাম দিলেন সূর্যকুমার। রাজা একদিন রাণীকে বললেন, "রাণী, এই ছেলের জন্য তুমি একটি বর চাও। যা চাইবে আমি তাই দেব।" রাণী বললেন, "যখন দরকার হবে তখন চেয়ে নেব।"

তারপর সূর্যকুমার বড় হলে, তার মা বললেন রাজাকে, "মহারাজ, এই ছেলে জন্মাবার পরে আপনি আমাকে একটি বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি এখন সেই বর ভিক্ষা করছি—এই ছেলেকে রাজা করুন।"

কিন্তু এমন গুণবান বড় দুই রাজপুত্র থাকতে ছোট ছেলেকে রাজ্য দেন কি করে? এ রকম তো নিয়মও নেই। রাজা সেই কথা বলাতে, রাণী ভারি বিরক্ত হলেন, আর রাজাকে ক্রমাগত এই নিয়ে জ্বালাতন করতে লাগলেন। রাজা পড়লেন মহা মুশকিলে। তাঁর মনে ভয় হল, পাছে রাণী বড় দুই ছেলের কিছু অনিষ্ট করেন। তাই তিনি একদিন ছেলে দুটিকে ডেকে বিমাতার বর চাওয়ার বিষয়ে জানালেন, আর বললেন, "ছোট ছেলেকে রাজ্য দিতে আমি চাই না। সেটা উচিতও নয়। তাকে রাজ্য না দিলে, পাছে রাণী তোমাদের কিছু অপকার করেন, তাই আমার ইচ্ছা, তোমরা দুজনে এখন বনে গিয়ে থাকো। আমার মৃত্যুর পরে এসে রাজ্য নিও।"

ছেলে দুটি বাবাকে প্রণাম ক'রে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তখন সূর্যকুমার উঠানে খেলা করছিলেন। সূর্যকুমার দাদাদের কাছে বনে যাবার কথা শুনে, তাঁদের সঙ্গে বনে যেতে চাইলেন। কিছুতেই তাঁকে ঠেকানো গেল না। কাজেই তিন ভাই এক সঙ্গে গেলেন বনে।

চলতে চলতে তাঁরা উপস্থিত হলেন হিমালয় পর্বতে। সেখানে একদিন বড় ভাই ছোট ভাইকে বলেন, "ভাই, ওই যে পুকুর দেখছ, ওই পুকুরে স্নান করো, জল খাও। আসবার সময়ে আমাদের জন্যও কিছু জল এনো।"

সেই পুকুরটি আগে ছিল ধনের দেবতা কুবেরের। তিনি সেটা দান করেছিলেন উদক নামে এক জলের রাক্ষসকে। উদককে তিনি বলে দিয়েছিলেন, "যে লোক জানে না দেবধর্ম কি, সে যদি এই পুকুরের জলে নামে, তবে তুমি তাকে খেতে পারো। কিন্তু জলে না নামলে তুমি তার কিছুই করতে পারবে না।"

সূর্যকুমার এসব বৃত্তান্ত জানতেন না। তিনি যেমনি পুকুরে নামলেন, অমনি উদক তাঁকে ধ'রে জিজ্ঞাসা করল, "দেবধর্ম কাকে বলে জান?"

সূর্যকুমার বললেন, "জানি বই কি। লোকে চন্দ্র ও সূর্যকে দেবতা বলে।"

"মিথ্যা কথা। দেবধর্ম তুমি জান না।" ব'লে রাক্ষস তাঁকে জলের ভিতর টেনে নিয়ে, একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখল।

ছোট ভাইয়ের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে, বড় ভাই চন্দ্রকুমারকে পাঠালেন তাঁর খোঁজে। চন্দ্রকুমারকে রাক্ষস সেই প্রশ্ন করল, আর তিনি উত্তর দিতে না পারাতে তাঁকেও জলের নীচে নিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে দিল।



উদক রাক্ষস রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করছে—দেবধর্ম কাকে বলে?

মেজ ভাইয়েরও দেরি হচ্ছে দেখে, বড় ভাই ভয় পেলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে নিজেই গেলেন পুকুরপাড়ে। গিয়ে দেখলেন, জলের কিনারা পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন রয়েছে পুকুরে নামবার কিন্তু উঠে আসবার চিহ্ন কিছু নেই। তখন তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, পুকুরে উদক রাক্ষস আছে। তিনি তীর ধনুক নিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাক্ষস যখন দেখল বড় ভাই জলে নামছেন না, তখন সে এসে তাঁকে ডাকতে লাগল জলে নেমে স্নান করতে, জল খেয়ে ঠাণ্ডা হতে, যেন কত আপ্যায়িত করতে চায়। বড় ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন আমার ভাইদের ধরেছ?"

রাক্ষস উত্তর দিল, "এই পুকুরের জলে যারা নামে তাদের আমি খাই।"

"সকলকেই খাও?"

"কেবল, যারা দেবধর্ম জানে, তাদের খাই না।"

"তুমি সত্যিই জানতে চাও দেবধর্ম কি?"

"হাঁ চাই। বল।"

"বলব; কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম দরকার।"

তখন রাক্ষস সুন্দর একটা ঘরে নিয়ে তাঁকে বসাল। নিজে তাঁর সামনে মাটিতে বসল। বড় ভাই বলতে লাগলেন, "শোনো তবে, বলি—যে লোকের মন সর্বদা শান্ত, যে সত্যবাদী, যে নির্মল অন্তরে ধর্ম পালন করে, আর মন্দভাব মনে এলে লজ্জিত হয়, সেই দেবধর্ম মতে চলে জানবে।"

রাক্ষস শুনে ভারী খুশী হয়ে বলল, "তোমার কথায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার একটি ভাইকে ফিরিয়ে দেব। বলো কাকে চাও।"

"সকলের ছোট ভাইটিকে আনো।"

"তুমি দেবধর্ম জান বটে, কিন্তু সে অনুসারে কাজ কর না। বড়কে ছেড়ে ছোটকে বাঁচালে বড়র মান কোথায় থাকে?"

"আমি দেবধর্ম মতেই কাজ করছি। ছোট ভাইটি আমাদের বিমাতার সন্তান। বিমাতা একে রাজা করতে চাইলে, বাবা রাজী না হয়ে, আমাদের বনে পাঠিয়ে দিলেন। ছোট ভাইটি তখন আমাদের ছেড়ে থাকতে চাইল না, নিজের ইচ্ছায় আমাদের সঙ্গে বনে এল। তাকে বাঁচানো আগে উচিত। তা ছাড়া, আমরা ফিরে গিয়ে যদি বলি, তাকে রাক্ষসে খেয়েছে সে কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?"

রাক্ষস তাঁর মহত্ত্ব দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে, মেজ ছোট দুই ভাইকেই ছেড়ে দিল।

মরকত মণি

এমন এক সময় ছিল, যখন পৃথিবীতে সবুজ রঙের মরকত মণি ছিল না। মানুষ তখন সমুদ্র থেকে মুক্তো তুলে আনত, মাটি খুঁড়ে হীরে আনত, কিন্তু মরকত মণির খোঁজও জানত না।

এক রাজা ছিলেন, তিনি পৃথিবীর যত ভাল ভাল জিনিস এনে তাঁর ভাণ্ডারে জড়ো করতেন। একদিন একটি লোক তাঁকে এসে বলল, "মহারাজ আপনার ভাণ্ডারে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর যে জিনিসটি, সেটি কি আপনি চান?"

রাজা বললেন, "নিশ্চয় চাই। সেটি কি?"

লোকটি বল্‌ল, "সেটি আছে মরকত মণির তৈরি একটি ফুলদানি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "মরকত মণি কি ?"

লোকটি উত্তর দিল, "মরকত মণি একরকম মণি। পৃথিবীতে কেউ সে মণি দেখে নি। সে মণির রং সমুদ্রের জলের চেয়ে সবুজ, গাছের পাতার চেয়েও উজ্জ্বল সবুজ।"

রাজা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে ফুলদানিটা কোথায় আছে ?"

"যেখানে সমুদ্রের ঢেউ কখনও খেলে না।"—লোকটি বল্‌ল। কিন্তু সে কোথায়—রাজা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখেন লোকটি চলে গেছে।

রাজা তাঁর সভার পণ্ডিতদের ডেকে বললেন, "সে কোন্ জায়গা, যেখানে সমুদ্রের ঢেউ কখনও খেলে না ?"

কেউ বলল, "বনের ভিতর।" কেউ বল্‌ল, "পাহাড়ের উপর।" শেষে একজন বল্‌ল, "সমুদ্রের নীচে, যেখানে জল সব চেয়ে গভীর।'

"ঠিক কথা", বললেন রাজা, "বনে কিংবা পাহাড়ে হ'লে লোকে তাকে কোন্ কালে খুঁজে বের করত।"

রাজা খুব জ্ঞানী ছিলেন, অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্রও জানতেন। তিনি ভাবলেন, "সমুদ্রের গভীর জলে ডুবতে পারে এমন ডুবুরি আমার রাজ্যে নেই। ডুবুরি দিয়ে এ কাজ হবে না। দেখি যদি মন্ত্রের জোরে কিছু করতে পারি।" এই ভেবে তিনি সমুদ্রের ধারে ধারে গিয়ে মন্ত্র আওড়াতে আরম্ভ করলেন।

গভীর জলের নীচে সমুদ্রের রাজা থাকেন, মরকত মণির ফুলদানিটি তাঁর। মন্ত্র শুনে তিনি বুঝলেন ফুলদানিটি আর তাঁর কাছে থাকবে না। তিনি তাঁর জলের রক্ষীদের ডেকে বললেন, "নাও, এই ফুলদানিটি পৃথিবীর রাজাকে দিয়ে এসো। কিন্তু সাবধান থেকো, আকাশের রক্ষীরা তোমাদের কাছ থেকে এটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করবে। তাদের কাছে দিও না—যিনি মন্ত্রের বলে একে ডেকেছেন তাঁকেই দিও।"

জলের রক্ষীরা যেমনি সেই আশ্চর্য ফুলদানি নিয়ে জল থেকে উঠে এল, অমনি আকাশের রক্ষীরা চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা নেব, আমরা নেব। পৃথিবীর রাজাকে কখনই দেব না।" "তখন জলের রক্ষী আর আকাশের রক্ষীদের ভিতরে ভয়ঙ্কর ঝগড়া লেগে গেল। একজনেরা জোর করে কেড়ে নেবে, অন্যেরা কিছুতেই দেবে না।

পৃথিবীর লোকে ভাবল, "বাপ্‌রে কি ভয়ঙ্কর ঝড় হচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আকাশের দিকে উঠছে, আর বাতাস গর্জন করে ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের জলকে ফেনিয়ে তুলছে। কি কাণ্ড।"

আসলে কাণ্ডটা হচ্ছে, দুই রক্ষীদের মধ্যে ঝগড়া। এই গোলমালে হঠাৎ আকাশের রক্ষীদের একজন ফুলদানিটা ছিনিয়ে নিয়ে, সোঁ করে উপরের দিকে উঠে গেল ; অমনি জলের রক্ষীদের

একজন পর্বতের চেয়ে উঁচু হয়ে তার পিছু ছুটে ফুলদানি কেড়ে নিতে গেল। দুইজনে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে সেই চমৎকার ফুলদানি আকাশ থেকে পড়ে গেল পাহাড়ের মাথার উপর আর একেবারে হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। অমন জিনিস তো দুনিয়ায় দুটি ছিল না, কাজেই তেমনটি আর কেউ পেল না। তার যে টুকরোগুলি ছড়িয়ে পড়ল, তাই এখন মানুষে মরকত মণি বলে যত্ন করে কুড়িয়ে নেয়।

ভূতেরও বাড়া

তুরস্কদেশে এক ছুতোর ছিল। বেচারী গরীব মানুষ, এমনিতেই কষ্টে থাকে। তার উপরে আবার তার স্ত্রীর মেজাজটি ছিল ক্ষুরের মত ধারাল। শুধু তাই নয়, তার গুণেরও শেষ ছিল না। ছুতোর যদি বলত, "গিন্নি, আজ ডালে নুন কম," পরের দিন ডাল হত নুনে পোড়া, মুখে দেওয়া যেত না। আর, তরকারিতে নুন বেশী হয়েছে বললে, পরের দিন সব রান্না হত আলুনী। ছুতোর যা রোজকার করে আনত, তার কড়াক্রান্তি হিসাব ক'রে স্ত্রী নিয়ে যেত, একটা পয়সাও দিত না ছুতোরকে।

একদিন ছুতোর মাইনের কয়েকটা পয়সা দড়ি কিনবার জন্য রেখে দিয়ে বাকিটা এনে স্ত্রীকে দিল। স্ত্রী বুঝতে পারল সবটা টাকা দেয় নি। তখন সে ভয়ানক বকাবকি আরম্ভ করল। ছুতোর বুঝিয়ে বলতে চাইল, "দড়ি কিনবার দরকার। তা এত বকছ কেন?"

স্ত্রী তাতে মারমূর্তি হয়ে তেড়ে এল, "শুধু কি বকুনিতেই শেষ হবে ভেবেছ? এই দেখ।" তারপর চল্‌ল কীল ঘুষি চপেটাঘাত।

পরদিন সকালে ছুতোর ঠিক করল, আর এরকম অত্যাচার সইবে না কিছুতে। সে একটা গাধায় চ'ড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চল্‌ল পাহাড়ের দিকে। স্ত্রীকে বলে গেল, "আমাকে খুঁজতে যেও না।"

খানিক বাদে স্ত্রীও বেরোল একটা গাধার পিঠে চড়ে। যাচ্ছে আর বিড় বিড় করছে, "যেমন আক্কেল ওর। কি না কি শেষটায় করে বসবে।"

খানিক দূর গিয়ে ছুতোর বুঝতে পেরেছে তার স্ত্রীও পিছনে পিছনে আসছে। কিন্তু সে তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে, পাহাড়ের কাছে গিয়েই কাঠ কাটতে লেগেছে। স্ত্রীটিও গাধা থেকে নেমে এদিক ওদিক ঘুরে দেখছে। পাহাড়ের তলায় একটা পুরানো কুয়ো ছিল, স্ত্রী সেটা জানত না। কুয়োর মুখটা ঘাস বনে ঢাকা, বোঝা যায় না সেখানে কুয়ো আছে। স্ত্রী সেই দিকে যেতে, ছুতোর এক চীৎকার দিল, "খবরদার ওদিকে যেও না, ওখানে একটা কুয়ো আছে।" এই বলতে

বলতে, স্ত্রী দুই পা এগিয়েছে, আর একেবারে ঝপ্ ক'রে কুয়োর মধ্যে! ছুটে এসে ছুতোর উঁকি মেরে দেখল, কুয়োর ভিতর খালি অন্ধকার। ডাকাডাকি করল, কেউ সাড়া দিল না। তখন সে ফিরে গেল বাড়ি।

বাড়িতে দড়ি ছিল না, গোলমালে কেনাও হয় নি। বাজার থেকে একটা দড়ি কিনে নিয়ে ছুতোর চল্‌ল আবার সেই কুয়োর কাছে। অনেকটা দূর পথ, যেতে আসতে দড়ি কিনতে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অন্ধকারে দড়িটা কুয়োর ভিতর নামিয়ে দিয়ে ছুতোর ডাকল, "গিন্নি, শক্ত করে ধর দড়িটা, আমি তোমাকে টেনে তুলছি।"

একটু পরেই ছুতোর বুঝতে পারল কেউ দড়িটা ধরেছে, দড়ি বেশ আঁট হয়ে উঠেছে। তারপর প্রাণপণে সে দড়ি ধরে টানতে লাগল। সে ঘেমে গেল, তার কপালের শিরা ফুলে উঠল। হাত দুটো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে টেনেমেনে উপরে তুললো দড়ি। সর্বনাশ!! এ তো তার স্ত্রী নয়, এ যে একটা বিদ্‌ঘুটে ভীষণ চেহারার ভূত? ছুতোর তো ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করেছে।

ভূত বল্‌ল, "কিছু ভয় নেই ভাই। তুমি আজ ভারি উপকার করলে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

ছুতোর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি বিপদে পড়েছিলে তুমি? কি হয়েছিল?"

"আরে ভাই, কত বছর থেকে আমি এই কুয়োটাতে আছি। আজ সকালে হঠাৎ কোথা থেকে একটা মেয়েমানুষ এসে ধমাস্ ক'রে আমার ঘাড়ের উপর পড়ল। পড়েই, আমার কান দুটো সে এমন আঁকড়ে ধরল, যে কি বলব। কিছুতেই ছাড়াতে পারছিলাম না। ভাগ্যি তুমি দড়িটা ফেল্‌লে। দড়ি দেখে আগেই আমি খপ্ করে সেটা ধ'রে ফেললাম। বড্ড বেঁচে গেছি। এমন সাংঘাতিক মেয়েমানুষ আমি জন্মে দেখি নি। তুমি আমার ভারি উপকার করেছ। আমি তোমাকে তার পুরস্কার দেব।"

"আমার স্ত্রীর কি হ'ল?"

"কে জানে কি হল। এতক্ষণে বোধ হয় অক্কা পেয়েছে। মানুষ তো।"

তারপর ভূত তিনটে পাতা এনে ছুতোরের হাতে দিয়ে বল্‌ল, "আমি বাদশার মেয়েকে গিয়ে আশ্রয় করব। তাহলে তার ভারি অসুখ করবে। দেশের ওঝা বদ্যি কেউ তাকে ভাল করতে পারবে না। এই খবরটা শুনে তুমি বাদশার কাছে যাবে। তারপর এই পাতা তিনটে মেয়ের মুখে ছোঁয়ালেই, আমি তাকে ছেড়ে চলে যাব। তুমি মেয়েকে ভাল করেছ দেখে, বাদশা তোমাকে কত বকশিশ দেবেন বুঝতেই পারছ।"

পাতা তিনটে ছুতোরকে দিয়ে কুয়োর ভূত বাদশার বাড়ি চলে গেল। গিয়েই রাজকন্যাকে আশ্রয় করে বসল। সেই মুহূর্তে কন্যা ভীষণ চীৎকার করে উঠল, "আমার মাথা ফেটে গেল, মাথা ফেটে গেল, উঃ—মরে গেলাম!" বাদশা খবর পেয়ে ছুটে গেলেন মেয়ের কাছে।

দেখতে দেখতে বদ্যি-কবিরাজে রাজার বাড়ি ভ'রে গেল। কিন্তু কোনই ফল হল না, কেউ কন্যাকে সুস্থির করতে পারল না, তার যন্ত্রণা কমাতে পারল না। ওষুধপত্র সবই বৃথা হল।

এদিকে ছুতোর বাড়ি গিয়ে চুপটি করে ঘরে ব'সে থাকে। তার মন খারাপ। ভূতের কথা পাতার কথাও যেন সে ভুলে গেছে। এমন সময়ে একদিন বাদশার লোক ঢেঁড়া পিটিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, "বাদশাজাদির ভারি অসুখ। যে তাঁকে ভাল করতে পারবে, বাদশা তাকে জামাই করবেন। আর তাঁর মৃত্যুর পর সে-ই রাজা হবে।"

শোনা মাত্র ছুতোরের মনে পড়ে গেল পাতা তিনটের কথা। রাজা হবার লোভ সে সামলাতে পারল না। তাড়াতাড়ি পাতা নিয়ে ছুটলো রাজবাড়িতে। তাকে তখনি মেয়ের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ছুতোর পাতা তিনটে একটু জলে ভিজিয়ে নিল। তারপর মেয়ের মুখে সেগুলি দু-তিনবার বুলোতেই বেদনা-টেদনা কোথায় চলে গেল, রাজকুমারী উঠে বসলেন। তখন আনন্দের ধুম পড়ে গেল সেখানে। বাদশা খুব ঘটা ক'রে ছুতোরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

এই বাদশার রাজ্যের কাছেই, তাঁর বন্ধু বাদশার রাজ্য ছিল। কুয়োর ভূতটা গিয়ে সেই বাদশার মেয়েকে আশ্রয় করল। এ মেয়েও তেমনি "মাথা গেল, মাথা গেল" ব'লে চেঁচাতে আরম্ভ করল। ওঝা-ফোঝা কেউ তাকে ভাল করতে পারল না। তখন ছুতোরের শ্বশুর খবর পেয়ে, ছুতোরকে পাঠিয়ে দিলেন বন্ধুর মেয়েকে সারাবার জন্য। পুরানো পাতা তিনটায় কিছু কাজ হবে কি না হবে ভাবতে ভাবতে ছুতোর গিয়ে উপস্থিত হল বন্ধু বাদশার বাড়িতে। সেখানে রাজকন্যাকে দেখেই ছুতোর বুঝতে পারল, এ কুয়োর ভূতেরই কাণ্ড। তখন সে অন্যদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে, দরজা বন্ধ করল। দরজা বন্ধ করতেই, কুয়োর ভূত ব'লে উঠল, "তুমি আমার উপকার করেছিলে, তার বদলে আমিও তোমার উপকার করেছি। বাদশার মেয়েকে বিয়ে করেছ। এই মেয়েটিকে পছন্দ করে আমি আশ্রয় করেছি, একেও কেড়ে নিতে চাও? তা যদি কর, তবে নিশ্চয় বলছি, তোমার বাদশাজাদী স্ত্রীকে আমি কেড়ে নেব।"

ছুতোর ভারি মুশকিলে পড়ে গেল। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাল। ছুতোর কুয়োর ভূতকে বল্‌ল, "আরে ভাই, এই রাজকন্যার জন্য কি আমি এসেছি? এ তো তোমারই জিনিস। চাও তো আমার স্ত্রীকেও তোমায় দিয়ে দিতে পারি।"

"তবে তুমি এখানে কি করতে এলে?"

ছুতোর কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌ল, "আরে ভাই, আমার সেই আগের স্ত্রীর কথা বলতে এসেছি। সেই যে বেচারী কুয়োয় পড়ে গিয়েছিল।"

সে মেয়েমানুষের নাম শুনেই ভূতের পিলে চমকে গেল, মহা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সে কি কুয়ো থেকে উঠে এসেছে?"

"শুধু কি উঠে এসেছে? উঠে এসেই আমার পিছন ধরেছে, কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। দেখ না,

এখান পর্যন্ত পিছু পিছু এসেছে। ঐ দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তো দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছি পাছে তোমায় দেখতে পায়।"

সেই দারুণ মেয়েমানুষ দরজার পিছনে আছে শুনেই কুয়োর ভূত কোনও দিকে না চেয়ে, রাজকন্যাকে ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। আর কোনো দিন তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাজকুমারীকে ভাল ক'রে, ছুতোর মনের আনন্দে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেল।

দুয়োরাণী

রাজা গেছেন বিদেশে। রাজার দুই রাণী, সুয়ো আর দুয়ো, বাড়ি আছেন। সুয়োরাণী সাত মহলা প্রাসাদে থাকে, পাট শাড়ি জড়োয়া গহনা প'রে ঘুরে বেড়ায়। দুয়োরাণীর খবর কেউ নেয় না। সে থাকে রাঁধুনীদের সঙ্গে, রান্নাবাড়ির এক পাশে। দাসীদের মত খাটে সে; বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, সুয়োরাণীর গা টিপে দেয়। তবুও সুয়োর ভারি হিংসা তার উপরে।

একদিন দুপুরবেলা দুয়ো রান্নাঘরের পাট সেরে, একটি খুদের নাড়ু হাতে নিয়ে, ছাতের উপর উঠল বিশ্রাম করতে। চিলে ছাতের ছায়ায় ব'সে, সে নাড়ুটি খেল; তারপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে তার চোখের পাতা বুজে এল।

ঠিক এই সময়ে, স্বর্গের পাখি বেঙ্গমা বেঙ্গমী উড়ে যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। বেঙ্গমী বলল "গ্যাখ, ঐ দুয়োরাণী ঘুমোচ্ছে। ওর দাঁতের ফাঁকে খুদের নাড়ু লেগে রয়েছে। চল যাই, খুদগুলি খেয়ে আসি।"

দুজনে নেমে এল দুয়োরাণীর পাশে, আর ঠুক্ ঠুক্ ক'রে ঠোঁট দিয়ে তার দাঁত থেকে খুদ খুঁটে খেতে লাগল। খেতে খেতে খেতে খেতে তাদের এত ভাল লেগেছে যে, খুদের সঙ্গে দাঁতগুলিও কখন খেয়ে ফেলেছে, টের পায় নি। যখন খেয়াল হল, বেঙ্গমী ব্যস্ত হয়ে বলল, "ও বেঙ্গমা, কি করলাম! দুয়ো বেচারীর একেই কত কষ্ট, তার উপরে সে যদি ফোকলা হয়ে থাকে, সবাই তাকে দেখে হাসবে।" বেঙ্গমা উত্তর করল, "যা হয়ে গেছে তা তো গেছে। ওর নিজের দাঁত তো নেই। চল যাই, আমরা স্বর্গ থেকে সোনার দাঁত এনে ওর মুখে বসিয়ে দিই।" এই ব'লে তারা উড়ে গেল আর স্বর্গ থেকে সোনার দাঁত এনে দুয়োর মুখে বসিয়ে দিল। দুয়ো এ সব কিছুই জানতে পারল না।

দুয়োরাণীর মনটি ভারি ভাল, মুখে হাসিটি লেগেই থাকে। সুয়োরাণীর খবরাখবর করে সে। বিকালবেলা ছাত থেকে নেমে এসে, হেসে হেসে সে সুয়োরাণীকে জিজ্ঞাসা করছে, "রাত্রে কি খেতে ইচ্ছা?" সুয়ো চেয়ে গ্যাখে, দুয়োর মুখে সোনার দাঁত ঝক্ঝক্ করছে। দেখে, তার কথা স'রল না প্রথমে। তারপর ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কোথায় গিয়েছিলি?"

"কোথাও তো যাই নি। এতক্ষণ, একটু খুদের নাড়ু খেয়ে, ছাতের উপর ঘুমিয়ে ছিলাম। এই নেমে আসছি।"

সুয়ো তাকে আর কিছু বলল না।

পরদিন দুপুরে সুয়োর সখ হল খুদের নাড়ু খেতে। দাসীরা সকলে চলে গেলে, সুয়ো ছাতে উঠল আর নাড়ুটা মুখে ফেলে, ঘুমের ভান ক'রে শুয়ে রইল। সেদিনও বেঙ্গমা বেঙ্গমী উড়ে যাচ্ছিল সেই পথে। সুয়োর মুখে খুদের নাড়ু দেখে, তারা নেমে এসে নাড়ু খেতে লাগল। আজও পাখিরা নাড়ু খেতে খেতে সুয়োর দাঁত সব খেয়ে ফেলল। তারপর তারা বলাবলি করল, স্বর্গ থেকে দাঁত এনে সুয়োর মুখে লাগিয়ে দেবে। তাই শুনে সুয়ো ব'লে উঠল, "দুয়োর চেয়ে ভাল দাঁত দিও। দুয়োর চেয়ে ভাল দাঁত দিও।" যেই না বলা, পাখিরা ভয় পেয়ে ফুড়ুক ক'রে উড়ে পালালো, আর এল না। সুয়োর দাঁতও বসানো হল না।

ফোকলা হয়ে নীচে এসে সুয়োরাণীর এমন রাগ হল দুয়োরাণীর উপরে যে, সে তখনি তাকে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে।

দুয়োরাণী কখনও পথে বেরোয় নি, রাস্তা চেনে না। যে দিকে দু চোখ যায় সে চলতে লাগল। চলতে চলতে ভয়ানক পরিশ্রম বোধ হল তার। সারা গায়ে ধুলো মাটি ভ'রে গেছে, খিদেও পেয়েছে খুব। পথের পাশে একটা পুকুর ছিল। পুকুর দেখে, দুয়ো ভাবল, "ডুব দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিই, তারপরে খাবার চেষ্টা দেখা যাবে।" এই ভেবে সে পুকুরে নেমে পড়ল। ডুব দিয়ে যখন উঠেছে, তখন তার মাথার চুল মেঘের মত ঘন হয়ে, পা পর্যন্ত লোটাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে উঠে এল জল থেকে। কাছে কোথাও দোকানপাট ছিল না, খাওয়া আর হল না। একটু দূরে একটা মন্দির দেখতে পেয়ে, দুয়ো তার ভিতরে ঢুকলো রাত কাটাবার জন্য।

মন্দিরটি ছিল কালীর মন্দির। কালী মূর্তির বেদীর কাছে দুয়ো ঘুমিয়ে পড়ল। ভোররাতে গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল তার। কতগুলো লোক ঢুকেছে মন্দিরের ভিতর। তারা সব দস্যু। প্রতিদিন রাত্রে তারা চুরি ডাকাতি করবার পর, এই কালীর মন্দিরে এসে পূজো দেয়। আজও পূজো দিতে এসেছে তারা। তাদের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে, দুয়োরাণী তাড়াতাড়ি উঠে কালী মূর্তির পিছনে গিয়ে, ঠিক কালী ঠাকরুণের মত জিব বের ক'রে হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মূর্তির কাছে যেতে, দস্যুরা ছাখে, স্বয়ং কালী ঠাকরুণ দাঁড়িয়ে আছেন, জিব বের করে, হাত ছড়িয়ে; তাঁর চুলের রাশি পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। দস্যুরা সে রাত্রে অনেক গহনাপত্র চুরি করে এনেছিল। ঠাকরুণের দেখা পেয়ে ভক্তির চোটে তারা সব গহনাগুলি একে একে পরিয়ে দিল কালীমায়ের গায়ে, মানে দুয়োরাণীর গায়ে। তারপর চলে গেল দস্যুরা।

এক গা 'গহনা' নিয়ে, মাথা ভরা এক রাশ চুল নিয়ে, ভোরের আবছা আলোতে দুয়োরাণী ফিরে এল নিজের বাড়ির দরজায়। সুয়োরাণীর ঘরে গিয়ে সে গহনাগুলি খুলে সব তাকে দিল।

মনে করল, তাহলে সুয়ো খুশি হয়ে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। কিন্তু দুয়োর সোনার দাঁত আর চুলের রাশির দিকে চেয়ে, অত গহনা পেয়েও সুয়ো খুশি তো হলই না; বরং হিংসায় তার বুক ফেটে যেতে লাগল।

দুয়োরাণীর চুল কি করে এমন চমৎকার হল, কেমন ক'রে গহনা পেল সব কথা সুয়ো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল তার কাছ থেকে। তারপর দুপুরবেলা চুপি চুপি, নিজের পাট শাড়ি আর গহনা খুলে ফেলে, একখানা সাধারণ শাড়ি পরে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। পথ চলতে চলতে সেই পুকুরের ধারে সুয়ো এসে হাজির। জলে নেমে একটা ডুব দিতে তার চুল বেড়ে বেড়ে মাটিতে ঠেকল। সুয়ো মনে মনে বলল, "দাঁত তো নেই, তবু যদি দুয়োর চুল পাই তো হয়। একটা ডুবে এত এত বেড়েছে, আরেকটা ডুব দিলে নিশ্চয় আরো বাড়বে।" এই ভেবে সে আর একটা ডুব দিল। ডুব দিয়ে যখন উঠেছে, ওমা—তখন তার মাথায় এক গাছিও চুল নেই, একেবারে নেড়া। হায় রে হায়! কিন্তু কি করবে? ভাবল, "যাই, মন্দির কোথায় দেখি। তবু যদি গহনা কিছু পাওয়া যায়।"

মন্দির কাছেই ছিল। সে রাত্রেও দস্যুরা এল পূজো দিতে। কিন্তু সেদিন তারা বিশেষ কিছু লুঠ করতে পারে নি, তাই তাদের মন ভারি বেজার। কালী মূর্তির কাছে যেতে দ্যাখে, মূর্তির পিছনে একটা নেড়ি ব'সে আছে। তাঁরা চেঁচিয়ে উঠল, "আরে আরে, এই নেড়িটাই যত নষ্টের গোড়া, অপয়া। এইটার জন্যই আজ আমরা কিছু পাই নি। মার এটাকে।"

সুয়োরাণী কোনও মতে প্রাণ নিয়ে পালালো সেখান থেকে। ছুটতে ছুটতে যখন সে বাড়ি পৌছল, তখন তার আর দেমাক নেই। দুয়োরাণী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ভাবনা কি? রাজা মশাই তোমার সোনার দাঁত বাঁধিয়ে দেবেন। আমার সুন্দর চুল দিয়ে পরচুলা করিয়ে দেবেন।"

গিনিপিগের ল্যাজ

একটি ছেলের একটা গিনিপিগ্ ছিল। গিনিপিগদের চেহারা গোলগাল, কতকটা খরগোশের মত, তবে কান খরগোশের মত নয়, কান ছোট।

ছেলেটির বন্ধুরা যখন খেলতে আসত, সে তামাশা করে মাঝে মাঝে তাদের বলত, "গিনিপিগটার ল্যাজ ধরে ঝুলিয়ে দ্যাখ, কেমন মজা হবে।" তাই শুনে গিনিপিগের ভারি ভয় হত। সে তার বাক্সের কোণে গিয়ে লুকোত।

সে ঘুরে ফিরে চেষ্টা করত দেখতে, তার ল্যাজটা কত লম্বা, কিন্তু গোলগাল শরীরের পিছনে ল্যাজটা দেখতে পেত না। শেষটায়, "দূর ছাই, এত ভয়ে ভয়ে থাকা যায় না, ল্যাজ কেটে ফেলে দিলে আপদ চুকে যায়," বলে, এক রাত্রিবেলা সে বাক্স থেকে বেরিয়ে পড়ল আর চলে গেল জঙ্গলে।

সেখানে নালার ভেতরে এক সজারুর সঙ্গে তার দেখা। সজারুকে সে বল্‌ল, "সজারু ভাই একটা কাজ করবে ?"

"কি কাজ ?"

"ভাই আমার ল্যাজটা কেটে দেবে ?"

সজারু খানিক তার দিকে চেয়ে রইল, তারপর মাথা নাড়ল, তারপর হাসতে লাগল।

"হাসছ কেন ?" জিজ্ঞাসা করল গিনিপিগ।

"অমনি, তা তুমি কেন কাঠবিড়ালীর কাছে যাও না ? তার সুন্দর ল্যাজ আছে। সে হয়ত ল্যাজের বিষয়ে বুঝবে।

গিনিপিগ ছুটল যেখানে কাঠবিড়ালী ঘুমিয়ে ছিল গাছের উপরে। কাঠবিড়ালীকে সে বল্‌ল, "ভাই, একটা কাজ করবে ?"

"কি কাজ ?"

"ভাই আমার ল্যাজটা কেটে দেবে ?"

কাঠবিড়ালীও খানিক তার দিকে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

ভারি আশ্চর্য হয়ে গিনিপিগ জিজ্ঞাসা করে, "হাসছ যে ?"

"ওমনিই। তা তুমি পেঁচার কাছে যাও। তার ঠোঁট খুব ধারালো।"

তখন কাঠবিড়ালীকে ফেলে, গিনিপিগ ছুটল পেঁচার কাছে। পেঁচা মাঠের মাঝে বসে ছিল গম্ভীর হয়ে। গিনিপিগ তাকে বল্‌ল, "পেঁচাদাদা, একটা কাজ করবে ?"

"কি কাজ ?"

"আমার ল্যাজটা কেটে দেবে দাদা ?"

পেঁচাও ভয়ানক জোরে হেসে উঠল এ কথা শুনে। থতমত খেয়ে গিনিপিগ জিজ্ঞাসা করল, "হাসছ কেন ?"

"হাসি পাচ্ছে। কিন্তু আমি ল্যাজ কাটতে পারব না। আমি বলি কি, তুমি কাকের কাছে যাও। তার একটা ঝকঝকে কাঁচি আছে।"

তাড়াতাড়ি কাকের কাছে গিয়ে গিনিপিগ বল্‌ল, "কাকদাদা, একটা কাজ করবে ?"

"কি কাজ ?"

"দাদা, আমার ল্যাজটা কেটে দাও না।"

কাক প্রথমে কাঃ কাঃ করে খুব একচোট হাসল। তারপর কাঁচি নিয়ে এসে গিনিপিগকে বলল, "দেখি পেছন ফের।"

সে ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "লাগবে না তো ?"

"একটুও না।"

তারপর কাঁচির শব্দ হল কচ্ কচ্ কচ্ কচ্।

গিনিপিগ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "কিছুই তো লাগল না! কই কাকদাদা ল্যাজটা দেখি।"

"ওরে বোকা, তুই কি জানিস না যে গিনিপিগদের ল্যাজ থাকে না!" বলে কাঃ কাকা কাওয়া কাওয়া করে হাসতে হাসতে কাকের পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়।

নিরানব্বুইএর ধাক্কা

এক গ্রামে এক ধনী বণিক থাকে, আর থাকে এক ওস্তাদ ছুতোর। দুইজনে ভারি বন্ধুতা। কিন্তু দুইজনের স্বভাব উল্টো। ধনী যে, সে ভয়ানক কৃপণ, একটি পয়সা বেশী খরচ হলে তার প্রাণ যায় যেন। বাড়িতে সকলে শাক ভাত খায়, মোটা কাপড় পরে। তাইতে পয়সা বাঁচে অনেক।

এদিকে ছুতোর গরীব নয়। তার আয় মন্দ হয় না। কিন্তু সে অত্যন্ত খরচে। তাই এক এক সময়ে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়ে পড়ে। তার বাড়িতে খুব খাওয়াদাওয়ার ধুম, রোজই মাছ দই ক্ষীর মিষ্টি, নানা রকম সুখাদ্য তৈরী হয়। ছুতোরের বৌ যায় বণিকের পুকুরে জল আনতে। বণিকের বৌও আসে সেখানে। দুইজনে গল্পস্বল্প হয়, ঘর-গৃহস্থালী কথা, খাওয়াদাওয়ার কথা। রোজই বণিকের বৌ শোনে ছুতোরের বাড়িতে কত ভাল ভাল জিনিস রান্না হয়েছে। নিজেদের রান্নার কথা সে কিছু বলে না। তার লজ্জা করে, কেননা তাদের খালি ডাল ভাত শাক চচ্চড়ি দুই বেলা। সে কেবল শোনে।

শুনে শুনে, বণিকের বৌ একদিন বণিককে বলল, "ছুতোরের কতই বা আয়। অথচ ওদের বাড়ির লোকেরা খায়দায় কি চমৎকার। তোমার এত টাকা থাকতেও, আমরা কিনা খাচ্ছি দু বেলা শাক ভাত। ছি ছি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।"

রোজ স্ত্রীর কাছে গঞ্জনা শুনে, বণিক ভাবল, "এর একটা উপায় করতে হবে। আমি বোকা নই, ছুতোরের মত টাকা ওড়াব না। বন্ধুকেই মিতব্যয়ী হতে শেখাতে হবে। শেখানো উচিতও, নইলে সে দুদিনে ফতুর হয়ে যাবে।"

এরপরে একদিন বণিক বেড়াতে বেড়াতে ছুতোরের বাড়ি গেল। ছুতোর খুশি হয়ে বন্ধুকে ডেকে বসাল, নানা রকম খাবার এনে খেতে দিল। বন্ধু চলে গেলে, ছুতোরের নজরে পড়ল, যেখানে বণিক বসেছিল, সেইখানে একটা টাকার থলি পড়ে আছে। 'নিশ্চয় বন্ধু এটা ফেলে গ্যাছে' মনে ক'রে সে টাকার তোড়াটি নিয়ে গেল ধনীর কাছে। ধনী তো অবাক। বলে, "সে কি? আমি কেন টাকা ফেলে আসব? এত টাকা ফেলে আসব, আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

ছুতোর আর কি করে, টাকার তোড়াটি নিয়ে বাড়ি ফিরল। ফিরে এসে, থলি খুলে টাকাগুলি গুনে ছাখে, নিরানব্বুইটা টাকা আছে। সে মনে ভাবল, 'নিশ্চয় ভগবান দয়া ক'রে আমায় টাকাগুলি দিয়েছেন। নইলে কোথা থেকে আসবে এ টাকা?'

যাই হোক, নিরানব্বুই টাকাতে সে আর একটি টাকা দিয়ে, এক শ' টাকা পুরিয়ে থলির মধ্যে রেখে দিল। সেই একটি টাকা সেদিনকার খরচ থেকে কাটা গেল। ক্রমে তার মাথায় ঝোঁক চাপল, ওই এক শ' টাকাকে দুই শ' করতে হবে। রোজ সে কিছু কিছু ক'রে টাকা জমাতে আরম্ভ করল। কাজেই সংসার খরচ ক্রমেই কমতে থাকল। অত মাছ মিষ্টি কেনা চলে না আর। বণিকের



ছুতোর খুশি হয়ে বন্ধুকে ডেকে বসাল, নানারকম খাবার এনে খেতে দিল।

বাড়ির মত তার বাড়িতেও শাক ভাত খাওয়া আরম্ভ হল। এদিকে টাকা জমতে জমতে দাঁড়াল সাত শ'তে।

ধনী বন্ধু ছুতোরের কাণ্ডকারখানা সবই দেখছে। একদিন সে হাসতে হাসতে গিয়ে তাকে বলল, "বন্ধু, এইবারে আমার সেই নিরানব্বুই টাকা ফিরিয়ে দাও। তোমাকে নিরানব্বুইএর ধাক্কায় ফেলে, সঞ্চয়ী হতে অভ্যাস করাবার জন্য আমিই সেদিন ওই টাকা তোমার বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলাম।" ছুতোর তখনি টাকা ফিরিয়ে দিল। তবে, তার সঞ্চয় করা অভ্যাস আর তাকে ছাড়ল না। টাকা জমাবার জন্য যেমন সে কষ্ট স্বীকার করত, তেমনি জমিয়েছিল অনেক।

চার ছেলে

এক মহাজনের চার ছেলে। মহাজনের যখন মরবার সময় হল, তিনি ভাবলেন, 'আমি চোখ বুজলে ছেলেরা সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করবে হয়ত। অনেক টাকা নষ্ট করবে।'

মহাজনের এক ভায়রাভাই ছিলেন, তিনি খুব বুদ্ধিমান এবং বিবেচক। একদিন মহাজন ছেলেদের ডেকে বললেন, "আমি আছি বলে সংসার চলছে। আমি চোখ বুজলে, যদি তোমরা চার ভাই আলাদা হয়ে যেতে চাও, তবে তোমাদের মেসোমশাইয়ের পরামর্শ নিও। তিনি যাকে যেমন ভাগ ক'রে দেবেন, সেই রকম সে নেবে।" তারপর তিনি মারা গেলেন।

চার ভাইয়ের মধ্যে, বড় ভাই পড়াশোনা করে। মেজ ভাই উকিল। ছোট দু ভাই চাষবাস করে, রোদবৃষ্টিতে সারাদিন খাটে। ঘরে এসে, দুটি মোটা ভাত খেয়ে, যেখানে হোক শুয়ে পড়ে। বড় ভাই এদিকে ওদিকে কাজে যায়। ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে খাটে শুয়ে আয়েস করে। বড় দুই বৌও কুটোটি কাটে না, ভাল কাপড় চোপড় পরে, পায়ের উপর পা তুলে ব'সে থাকে।

ছোট দুই বৌ-এর তা সহ্য হয় না। তারা ছোট দুই ভাইয়ের কানে মন্ত্রণা দেয়, "কেন? তোমরা কি ভেসে এসেছ? যে যার ভাগ আলাদা ক'রে নাও। সুখে থাকা যাবে।"

ছোট ভাইরা গিয়ে বড় ভাইদের বলল, "আলাদা হব।" বড় ভাইরা বলল, "বেশ। বাবা তো বলে গেছেন, আলাদা হতে হলে মেসোকে ডাকতে। তাঁকে ডেকে আনি। যেমন ভাগ ক'রে দেবেন, আমরা তাতেই রাজী।"

মেসো এসে বললেন, "হ্যাঁ, আমি আগেই জানি। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে আমার উপরে হুকুম হয়েছে, ভাগ-বাটরা করবার আগে তোমাদের চার ভাইকে আর চার বৌকে নিয়ে পুরুষোত্তম ধামে যেতে। সেখানে গিয়ে সকলে ঠাকুর প্রণাম করে এলে পর, তোমাদের সম্পত্তি আমি ভাগ করে দেব।"

যে কথা সেই কাজ। চার ভাই আর চার বৌকে নিয়ে তিনি গেলেন জগন্নাথ দর্শন করতে। ফিরে আসবার সময়ে পথে এক মস্ত মাঠ পড়ল। সকাল গেল, দুপুর গড়িয়ে গেল, মাঠ আর শেষ হয় না। "আর চলতে পারছি না। এখানেই থেকে যাই আজ। এখানেই রোদ বর্ষা পুইব।" ব'লে মেসোমশাই ব'সে পড়লেন সেখানে। তারপর তিনি ট্যাঁক খুঁজে থলি বের করতে গিয়ে দেখেন, হায় হায়, কোথায় পড়ে গেছে সেটা! তাই তো, কি হবে এখন?

মেসো তখন বললেন, "তোমরা চার জনেই কাজের লোক। চার জন চার দিকে চলে যাও। কে কি রোজগার করে আনতে পার আন। এইখানেই রান্না-বান্না হবে। খেয়ে-দেয়ে তারপর ভাবা যাবে কি করা যেতে পারে।" চার ভাই চার দিকে চলে গেল।

সব চেয়ে ছোট ভাই চাষের কাজ জানে। যেতে যেতে, পথে সে দেখল, এক চাষা বলদ নিয়ে হাল চালাচ্ছে কিন্তু বলদটা কিছুতেই বাগ মানছে না, হাল চলছে না ; ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে চাষা। ছোট ভাই বলল তাকে, "আমি এই জমি দেখতে দেখতে চষে দিতে পারি। কি দেবে তাহলে বল।"

"পাঁচ সের চাল, ডাল আর তরকারি কিছু, এক বিড়ে কাঠ দেব।"

চাষা এই সব জিনিস যোগাড় করে এনে গ্যাখে, জমির চাষ শেষ। ছোট ভাই বসে ঘামছে। চাষা তার কোঁচড়ে জিনিসগুলি বেঁধে দিল। তাই নিয়ে ফিরল ছোট ভাই।

তার উপরের ভাই গিয়েছিল অন্যদিকে। এক জায়গায় দেখতে পেল, পাঁচ-ছয় জন লোক দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। সে তাদের কাছে যেতে, তারা বলল, "এ বিলে সব সময় জল দাঁড়িয়ে থাকে, ধান পোঁতা যায় না। অথচ জমিদার খাজনা আদায় করেন। এর উপায় কি হতে পারে?"

"কি দেবে? আমি উপায় বলতে পারি।" বলল সেজ ভাই। লোকেরা দুই টাকা দিতে রাজী হল। তখন সেজ ভাই তাদের বুঝিয়ে দিল, "মাটি আর গোবর মিশিয়ে, ডেলা ডেলা পাকাও। তার ভিতরে ধানের বীজ পুরে দাও। সেই ডেলাগুলো জলে ফেলে দিলে, নীচে ডুবে যাবে। তা থেকে ধানের গাছ বেরোবে।"

এ পরামর্শ সবাইয়ের মনের মত হল। তারা খুশি হয়ে সেজ ভাইকে দুটো টাকা দিল। তাই নিয়ে ফিরল সে।

মেজ ভাই যে, সে ন্যায়শাস্ত্র জানে। পথে গাছের তলায় বসে একজন কে কাঁদছে, নজরে পড়ল তার। বড় লোকের মত চেহারা লোকটির। মেজ ভাই তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে। সে যা বলল, তা এই, "আমরা চার ভাই ভিন্ন হলাম। সব সম্পত্তি ভাগ হল। সকলের ভাগে এক লক্ষ করে টাকা পড়ল। একটা কালো বেড়াল কেবল রইল ভাগ হতে। সকলেই বেড়ালটা চাইলাম। তখন ঠিক হল বেড়ালের এক-একটা পা, এক-এক ভাইয়ের। কিছুদিন বাদে, বেড়ালটা লাফাতে গিয়ে কেমন করে পড়ে যায় আর তার একটা পা ভেঙে যায়। আমার পা-টাই ভেঙে যায়। আমি সেই পায়ে তেল ন্যাকড়া জড়িয়ে বেঁধে দিলাম। তারপর এক পড়শীর বাড়ি গিয়ে বেড়াল উনুনের পাশে শুয়েছিল। কেমন করে তার পায়ের তেল ন্যাকড়াতে আগুন ধরে গেল। বেড়াল তো প্রাণের ভয়ে ছুটতে ছুটতে একজনদের মাচায় উঠল। ল্যাজের আগুন মাচায় লাগল, মাচার আগুন লাগল চালে। তার পর অনেক ঘরে ধরে গেল সেই আগুন।

"এখন সবাই বলছে আমার দোষে এই কাণ্ড হয়েছে। আমাকে সকলের ঘর নতুন করে বানিয়ে দিতে হবে। এত নতুন ঘর বানাতে গেলে, আমার কিছুই থাকবে না। কি যে করি। তাই বসে বসে কাঁদছি। যে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে তাকে আমি অনেক টাকা দেব।"

"যদি তোমাকে ঘর তোলার খরচ না দিতে হয়, তবে কত টাকা দেবে?"

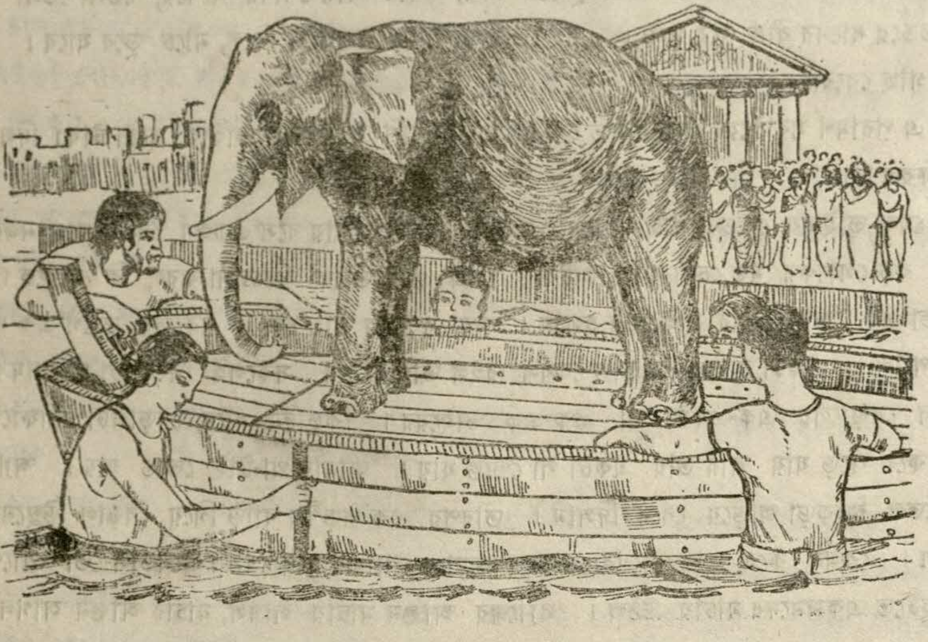
"পাঁচ শ' টাকা দেব।"

"গাঁয়ের মাতব্বরদের সব ডেকে এনে এক জায়গায় কর, আমি আসছি।"

মেজ ভাই গাঁয়ে গিয়ে ছাখে মাতব্বররা ব'সে আছে। মহাজনের ছেলে বিচার করবে শুনে, তারা ঘটনাটা সবিশেষ জানাল তাকে।

মেজ ভাই বলল, "বেড়ালের পায়ে আগুন ধরার জন্য ঘর পুড়ে গেল। সবাই বলছ, যে লোকের ঐ পা, তার দোষ। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, যদি বেড়ালের চলবার শক্তি না থাকত তবে সে পালাত কি করে? খোঁড়া পায়ে তো বেড়াল চলতে পারে না? অন্য তিনটা পা ছিল ব'লে না সে পালাল, আর ঘরে ঘরে আগুন লাগল; এতে অন্য তিন পায়ের দোষ না খোঁড়া পায়ের দোষ?"

মাতব্বরেরা কি উত্তর দেবে? শেষটায় উত্তর করল, "অন্য তিনটা পায়ের দোষ।" তখন ঠিক হল, অন্য তিন ভাই মিলে ঘর তুলে দেবে। বেজায় খুশি হয়ে খোঁড়া পায়ের মালিক মেজ ভাইকে পাঁচ শ' টাকা, আরও খাবার-দাবার দিয়ে বিদায় করল।



হাতীকে ডোঙার উপরে চড়ানো হল।

সবার বড় ভাই আরেক দিকে গিয়েছিল। সেখানের রাজার মন্ত্রীর বাড়ির সামনে যেতে, সে শুনতে পেল খুব কান্নাকাটি পড়ে গেছে বাড়িতে। কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করতে পথের লোকে বলল, "আমাদের রাজা আজ সকালে মন্ত্রীকে ডেকে বলেছেন, রাজার একদন্তা হাতীটার ওজন কত, তা যদি

মন্ত্রী আজকের মধ্যে বলে না দিতে পারে তবে মন্ত্রীর প্রাণদণ্ড হবে। এ কি মন্ত্রী বলতে পারবে? কাজেই তার প্রাণ যাওয়া নিশ্চিত।"

বড় ভাই মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করল। মন্ত্রী বড়ই ম্রিয়মাণ; বড় ভাইকে বলল, "যদি তুমি হাতীটা ওজন করিয়ে দিতে পার, আমার প্রাণ বাঁচাতে পার, হাজার টাকা দেব তোমাকে।"

"আচ্ছা ওজন করে দিচ্ছি। একটা ডোঙা আনাতে হবে।"

ডোঙা একটা আনা হল। হাতীকে তার উপরে চড়ানো হল। ডোঙাটা জলের ভিতর এক হাত ডুবে গেল। যে পর্যন্ত ডুবল, তার উপর বড় ভাই খড়ি দিয়ে দাগ কাটল। তারপর হাতীটা নামানো হলে ডোঙা আবার হয়ে গেল আগের মত উঁচু।

এবার বড় ভাই ডোঙাতে বালি ভর্তি করাল। বালির ভারে ডোঙা নামতে লাগল। যেমনি সেই খড়ির দাগ পর্যন্ত নামল, অমনি বালি ভরা থামিয়ে দিয়ে বড় ভাই বলল, "এবার বালি ওজন করলে হাতীর ওজনের সমান হবে।"

এক শ' মণ ওজন হল সেই বালির।

মন্ত্রীর তো যার-পর-নাই আনন্দ। সে বড় ভাইকে এক হাজার টাকা, আর অনেক জিনিস-পত্র দিয়ে যানবাহন পাল্কীতে পাটছাতা দিয়ে যেখানে মেসোমশাই বসে ছিলেন সেইখানে পাঠিয়ে দিল।

রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, মেসো চার ভাই আর চার বৌকে কাছে ডাকলেন। ছোট দুই ভাই এতক্ষণে নিজেদের অযোগ্যতা বুঝতে পেরেছে। তারা দাদাদের পায়ে প্রণাম করল। কেউ আর আলাদা হবার কথা তুলল না। চার ভাই আনন্দে ঘরে ফিরে গিয়ে মিলে মিশে রইল।

গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ

পুরাকালে সন্তাপন নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণ তিন কোটি মোহর রেখে স্বর্গে গেল। সন্তাপনের দুই ছেলে—সুপ্রতাপ ও বিভাস। তাদের বাপ মারা যাবার সময়ে বড় ছেলের কাছে টাকা রেখে গেল। সেজন্য ছোট ছেলের ভারি দুঃখ হওয়াতে, সে বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলল "আমাকে টাকার ভাগ দাও।"

বড় ভাই বলল, "বাবা তো টাকা ভাগ করে দেন নি। আমাকে দিয়ে গেছেন টাকা। তুমি কেন ভাগ বসাবে?"

দাদা যখন টাকা দিল না, তখন ছোট ভাই গেল বশিষ্ঠ নামে মুনির কাছে। মুনিকে সে বলল,

"দাদা আমাকে পিতৃধনের ভাগ দিচ্ছে না। তার কত অংশ আমার প্রাপ্য আপনি ব'লে দিন।" বশিষ্ঠ বললেন, "তার পাঁচ ভাগের তুই ভাগ তোমার প্রাপ্য। বেদে এই রকম বিধান আছে।"

ছোট ভাই তখন বড় ভাইকে গিয়ে বলে, "আমি বশিষ্ঠ মুনির কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, পাঁচ ভাগের তুই ভাগ ধন আমার প্রাপ্য। আমাকে সেই ধন দেবে না কেন?"

বড় ভাই বলে, "তুমি মুনি ঠাকুরের কাছে যেতে গেলে কেন? তিনি কি মনে করলেন। আমাকে কত নীচ ভাবলেন। ধনের জন্য এত ব্যস্ত হবার কি দরকার ছিল? যেমন তুষ্টু তুমি, তেমনি শাস্তি তোমার হোক। তুমি গজ হয়ে বনে চলে যাও।"



গরুড় নেমে এসে গজ ও কচ্ছপকে শূন্যে তুলে নিয়ে চলল উড়ে।

ছোট ভাইও রেগে বলে, "আর তুমি কচ্ছপ হয়ে পুকুরে যাও।"

তুজনের শাপেতে তুইজনে জন্তু হয়ে গেল। ছোট হল প্রকাণ্ড এক হাতী। সে গর্জন করতে করতে ছুটে চলে গেল বনে। বড় কচ্ছপ হয়ে চলে গেল মস্ত এক পুকুরে।

ধন নিয়ে যারা ঝগড়া করে, যারা দান করে না, তারা ধন ভোগ করতে পায় না।

তারপর, একদিন হাতী রোদে ঘুরে ঘুরে, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, একটা পুকুর দেখে সেখানে জল

খেতে গেল। সেই পুকুরে ছিল বড় ভাই কচ্ছপ। দুজনের দেখা হতে দুজনের মনে পড়ে গেল আগেকার কথা। গজ অমনি কচ্ছপকে শুঁড়ে জড়িয়ে টানতে আরম্ভ করল, ইচ্ছাটা বনের ভিতর টেনে নিতে। কচ্ছপও হাতীকে টানতে লাগল জলে নামাবার জন্য। দুজনে লেগে গেল তুমুল যুদ্ধ। দুজনেই সমান, কেউ কম যায় না। একটি বছর ধ'রে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলল তাদের মধ্যে। একদিন পাখির রাজা গরুড় আকাশে উড়ে যেতে যেতে এই যুদ্ধ দেখতে পেল। সেই সময়ে হাতীটা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে প'ড়ে প্রার্থনা করছিল, "আমার এই শাপে-পাওয়া জন্তুর শরীর নষ্ট হয়ে যাক। আমি মুক্তি পাই।"

তার প্রার্থনা শুনে গরুড়ের দয়া হল। সে নেমে এসে বাঁ পা দিয়ে ধ'রে গজ ও কচ্ছপকে শূন্যে তুলে নিয়ে, চলল উড়ে। তাদের খেয়ে ফেললে, তারা শাপমুক্ত হবে, এই হল গরুড়ের মনের কথা। কোথায় ব'সে খাবে তাই ভাবছে সে। দেখল, একটা প্রকাণ্ড বট গাছ দাঁড়িয়ে আছে, তার ডাল পালা মাইল মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তারি একটা ডালে গিয়ে বসল গরুড়। বসতেই, তাদের তিনজনের ভারে, মড় মড় ক'রে ডাল ভেঙে গেল। আবার উড়ল গরুড় গজ আর কচ্ছপকে নিয়ে। এবার বসল আকাশ ছোঁয়া সুমেরু পর্বতের চূড়োয়। খেতে যাবে যেই, পবন দেবতা এসে হাজির, বলে, "তুমি কেন এখানে? এ আমার জায়গা। যাও এখান থেকে।"

গরুড় বলে, "গোলমাল কর না। অত অহঙ্কার ভাল নয়।" শুনে, ভীষণ রেগে পবন বলে, "দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। পর্বতের চূড়ো ঠেলে আমি সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছি।"

"থাক। ঢের হয়েছে। পর্বতটা ফেলতে কি তোমার সাধ্য আছে?"

এই কথায় পবন রাগে অন্ধ হয়ে, হুহুঙ্কারে ঝড় উঠিয়ে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে দিল। গরুড়ও তার বিশাল দুই ডানা মেলে সুমেরু পর্বতকে ঢেকে রাখল। পবনের দাপটে সেই ডানার উপরে সাত দিন ধ'রে শিলাবৃষ্টি আর বজ্রপাত চলল। কিন্তু তবু পর্বত একটু নড়লও না।

এদিকে সৃষ্টিকর্তা দেবতাদের জিজ্ঞাসা করছেন, "অসময়ে এমন প্রলয় আরম্ভ হয়েছে কেন? তারপর তিনি নিজেই গেলেন দেখতে। গিয়ে তিনি পবনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জন্য হঠাৎ এমন প্রলয় কাণ্ড করছ? আমি এত কষ্ট ক'রে সব সৃষ্টি করলাম, সে সৃষ্টি তুমি নষ্ট করছ?" পবন তাঁর কথায় কান দেয় না, বলে, "প্রলয় যাতে হয় সেই চেষ্টাই করছি। যতক্ষণ না পর্বত ভাঙে, ততক্ষণ এমনি যুদ্ধ চালাব।"

তখন সৃষ্টিকর্তা গিয়ে গরুড় পাখিকে বললেন, "গরুড়, তুমি আমার সৃষ্টি রক্ষা করো। পবন কিছুতেই তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে না আমি জানি। তুমি নিজের ইচ্ছায় একদিক থেকে তোমার ডানা গুটিয়ে নাও।"

গরুড় তখন হেসে তার একটা ডানা গুটিয়ে নিল। পর্বতের সেই দিকের চূড়োটা ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেল সমুদ্রে।

রাবণের চন্দ্রলোক জয়

লঙ্কাদ্বীপের রাক্ষস রাজা একদিন রথে চ'ড়ে বেড়াচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিল সৈন্য-সামন্ত। এমন সময়ে আকাশে চাঁদ উঠল। চাঁদ উঠতে দেখে, রাবণ রেগে বলল, "কী! চাঁদের এত বড় স্পর্ধা! আমি লঙ্কার রাজা রাবণ। আমার ভয়ে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কম্পমান। আর, আমাকে ডিঙিয়ে যায় চাঁদ? আমাকে গ্রাহ্য করে না? দেখব চাঁদের কত তেজ। তার দর্প চূর্ণ করব।" এই ব'লে, সে চন্দ্রলোকে যাবার জন্য লোকজন নিয়ে রথ চালালো আকাশে।



রাবণ চন্দ্রলোকে যাবার জন্য লোকজন নিয়ে রথ চালালো আকাশে।

এখন চন্দ্রলোকে যেতে হলে, সাতটা স্বর্গ পেরিয়ে যেতে হয়। প্রথম স্বর্গের পর্বত, দ্বিতীয় স্বর্গের পর্বত পার হয়ে গেল রাবণ। তারপর উঠল গিয়ে তৃতীয় স্বর্গে। সেইখানে গঙ্গা ভাগীরথী। কত হাঁস কত পাখি সাঁতার কাটছে গঙ্গার জলে। গঙ্গায় স্নান ক'রে রাবণ সকলকে নিয়ে পৌঁছল চতুর্থ

স্বর্গে, যেখানে গৌরীশঙ্কর। তারপর, তার উপর শিবলোকে পৌছল রাবণের রথ। শিবলোকে যক্ষরা আর পিশাচেরা ছিল। আর ছিল অনেক দেবতা। তারা রাবণকে দেখেই, এদিকে ওদিকে গা ঢাকা দিল।

শিবলোকের উপরে বৈকুণ্ঠপুরী। বৈকুণ্ঠপুরী ঘুরে রাবণ গেল ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্মলোক ছাড়িয়ে গিয়ে সে চন্দ্রের দেখা পেল। রাবণকে দেখে চাঁদ আরম্ভ করল তুষার-বৃষ্টি। বরফে সৈন্যদের হাত-পা জ'মে যাচ্ছে। তারা অস্ত্র ধরতে পারছে না, বলছে, "চলো পালিয়ে যাই।" রাবণেরও ঠাণ্ডায় অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু সে যুদ্ধ ছাড়ছে না। তখন সে ছাড়ল আগুনের মহাবাণ। সে বাণে সব শীত দূর হয়। বাণ খেয়ে চন্দ্র অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কিন্তু একটু পরেই উঠে প্রাণ নিয়ে দৌড় দিল। পরিত্রাহি চীৎকার করতে করতে তারা সকলে পালিয়ে গেল।

তারপর চাঁদ কাঁদতে কাঁদতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পায়ে পড়ল গিয়ে। চাঁদের কান্না দেখে ব্রহ্মার দয়া হল। তিনি রাবণের কাছে গিয়ে বললেন, "শোনো রাবণ, চন্দ্রকে সকলে দেবতা বলে, চন্দ্র জগতে আলো দেয়। সে হিত ছাড়া অহিত করে না। তার সঙ্গে হানাহানি কি উচিত? শোনো, তোমার কানে কানে একটা মন্ত্র বলি, পাছে পরকে মারতে গিয়ে নিজে প্রাণে মর। দুইজনে যুদ্ধ হ'লে একজন মরে। অতএব যুদ্ধ বন্ধ করো।"

ব্রহ্মার কথা রাবণ অমান্য করতে পারল না।

গর ও নর

এক রাজার ছোট্ট দুটি ছেলে ছিল; একটি ছেলের নাম গর, অন্যটির নাম নর। তারা দেখতে ভারি সুন্দর ছিল। দেবতাদের রাজা আর রাণী অবাক হয়ে তাদের চেয়ে চেয়ে দেখতেন, আর ভাবতেন নিরিবিলি পেলে একদিন তাদের কোলে নিয়ে আদর করবেন।

সেই দেশের সমুদ্রের ধারে বালির উপরে ছেলে দুটি খেলে বেড়াত। সমুদ্রে ঢেউ না থাকলে তারা ছোট একটি নৌকোয় চড়ে মাছ ধরতে যেত। একদিন শান্ত সমুদ্র দেখে দুই ভাই নৌকোয় উঠে মাছ ধরতে গিয়েছে, এমন সময় ভয়নাক ঝড় উঠল। সেই ঝড় তাদের নৌকোখানা ঠেলে একেবারে মাঝসমুদ্রে নিয়ে গেল।

সমুদ্রের মাঝখানে ছিল একটি দ্বীপ, তাতে নৌকো গেল আটকিয়ে। ভাইরা তখন দ্বীপে নেমে এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে লাগল। দ্বীপে একটা ঘর ছিল, আর সেই ঘরে একজন বুড়ো আর একজন বুড়ি। বুড়ো বুড়ি তাদের দেখেই, কোলে তুলে নিয়ে গেল ঘরের ভিতর, আর আদর ক'রে মিঠাই খেতে দিল।

সেই বুড়ো বুড়ি কিন্তু আর কেউ নয়, তাঁরাই দেবতাদের রাজা আর রাণী। ছেলে দুটিকে ঝড়ে পড়তে দেখেই তাঁরা বুড়ো বুড়ি সেজে ছুটে এসেছেন তাদের রক্ষা করবার জন্য। আর সেই ফাঁকে তাদের কোলে নেবার সাধও মিটিয়ে নেবার জন্য।

ছেলে দুটি তাঁদের কাছেই রইল। তারা বুড়ো বুড়িকে খুব ভালবাসে। এর মধ্যে গরের বেশী ভাব বুড়োর সঙ্গে, নরের ভাব বুড়ির সঙ্গে। বুড়ো তো দেবতাদের রাজা। গর তাঁর কাছে নানারকম অস্ত্রের খেলা শেখে। নর বুড়ির কাছে, অর্থাৎ রাণীর কাছে বসে বসে সুন্দর সুন্দর কথা শোনে। বেশ আছে তারা। মাঝে মাঝে তারা মা-বাবার কাছে যেতে চায়। তখন শীতকাল, বড্ড ঝড়ের দিন, তাই যাওয়া হয়ে ওঠে না।

ক্রমে বসন্তকাল এল, ঝড় থেমে নীল আকাশ দেখা দিল, সমুদ্রও ঠাণ্ডা হল। তখন দেবতাদের রাজা তাদের দুজনকে নৌকোয় তুলে দিয়ে বললেন, "এখন তোমরা দেশে যাও।" দু ভাই নৌকোয় উঠে বসতেই ফুরফুরে হাওয়া এল, ঠেলে তাদের বাড়ির কাছে পৌঁছে দিল। নৌকো ডাঙায় ঠেকতে না ঠেকতেই গর লাফিয়ে পড়ল বালির উপর। কিন্তু সে এমন দুষ্ট যে নরকে উঠতে দিল না। নৌকাটাকে ধ'রে সে আবার ঠেলে দিল জলের ভিতর। অমনি কোথা থেকে উল্টো হাওয়া এসে নরের নৌকো ভাসিয়ে নিয়ে গেল কোন্ অজানা দেশে। সে দেশে নর বড় হল। সেইখানের এক মেয়েকে সে বিয়ে করে ঘরসংসার পাতল।

এদিকে গর বাড়ি এসে তার বাবাকে বলল, "বাবা, আমরা দুজনে নৌকো ক'রে আসছিলাম, এর মধ্যে নর যে কখন জলে পড়ে গেছে, টের পাই নি।" বাবা-মার মনে খুবই কষ্ট হল। তবে তাঁদের দুটি ছেলেই তো হারিয়ে গিয়েছিল, একটিকে যে ফিরে পেয়েছেন সেই ভেবে সান্ত্বনা পেলেন।

সেই সময়ে একদিন দেবতাদের রাজা আর রাণী স্বর্গে ব'সে গর আর নরের কথা নিয়ে তর্ক করছিলেন।···রাজা বললেন, "দেখ তো, আমার গর এখন কত বড় রাজা হয়েছে। আর তোমার নরের কি দুর্দশা, পেট ভ'রে খেতেই পায় না। স্ত্রীকে খাওয়াতে পারে না।" রাণী বললেন, "সে বরং ভাল। তোমার গরের মত দুষ্ট লোক হয়ে কাজ নেই। তার বাড়িতে অতিথি গেলে জায়গা পায় না।" রাজা বললেন, "বটে? আচ্ছা, এই দেখ, আমি দুঃখী পথিকের বেশে তার কাছে যাচ্ছি। তোমার কথা যে ভুল, তা এখনি প্রমাণ ক'রে দেব।" তারপর তিনি পথিকের বেশে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা পথিকের বেশে তিনি গরের দরজায় দেখা দিলেন। সেখানে যারা ছিল তারা গিয়ে গর রাজাকে বলল, "রাজামশাই, একজন বিদেশী লোক অদ্ভুত পোশাক প'রে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। দেখে মনে হয় যাদুকর-টাদুকর হবে।" গর বলল, "নিয়ে এসো দেখি।" লোকেরা ধ'রে নিয়ে গেল পথিক-বেশী দেবতার রাজাকে। তাঁর চেহারা দেখে গরেরও কেমন সন্দেহ হল, সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কি হে?" "আমার নাম গিরিমণি।" "তোমার বাড়ি কোথায়?" "বাড়ি নেই। পথে

পথে ঘুরে বেড়াই। এখানে একটু জায়গা পাব কি?" কিন্তু বিদেশীর কথাবার্তা শুনে গরের সন্দেহ যেন বেড়ে গেল। অচেনা লোককে আশ্রয় দিতে চাইল না সে। লোকদের ডেকে হুকুম করল, "একে বন্দী করো। এর মতলব ভাল নয় মনে হচ্ছে। দু পাশে দুটো আগুনের ধুনি জেলে, মাঝখানে একে দাঁড় করিয়ে রাখো। গরমে যখন পুড়তে থাকবে, তখন পেটের কথা সব বেরিয়ে পড়বে।" আট দিন আট রাত এমনি ক'রে তারা বেঁধে রাখল দেবতাদের রাজাকে। অবশ্য তিনি তো দেবতা, তাঁর এতে বিশেষ কিছুই এসে গেল না। তিনি খালি চুপ ক'রে দেখছেন এর পর কি করে।



গর রেগে আগুন হয়ে তলোয়ার নিয়ে ছুটে এল।

এদিকে গরের বাড়ির একজন লোক যখন দেখল বিদেশীকে এরকম ভাবে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, তখন তার ভারি দুঃখ হল, এবং দয়া হল। এ কয়দিন বিদেশীকে কিছুই খেতে দেওয়া হয় নি। তাই দুপুররাতে এক গ্লাস সরবত নিয়ে চুপি চুপি গেল বিদেশীর কাছে। চুপি চুপি বলল, "এই সরবতটুকু খাও, আরাম পাবে একটু। দেবতাদের রাজা দেখলেন,—এ যে নর। অত্যন্ত দুরবস্থায় প'ড়ে গরের বাড়িতেই কোন রকমে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে সে চাকরি করছে, কেউ তাকে চিনতে পারে নি!

আটদিন কেটে গেলে পরে লোকে শুনল বিদেশী চেঁচিয়ে গান ধরেছে। গানের কথা হল এই —গর যেমন দুষ্টু, তেমনি তার সাজা হবে। শুনে, গর রেগে আগুন হয়ে তলোয়ার নিয়ে ছুটে এল।

এসে দেখল, পথিকের বাঁধন সব আপনিই খুলে গেছে, আগুন নিভে গেছে, আর পথিকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন দেবতাদের রাজা নিজে। দেখে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেই যে গর পড়ে গেল, আর উঠল না। নিজের তলোয়ারের উপরে নিজে পড়ে গিয়েছিল।

তখন দেবতাদের রাজা নরকে সে দেশের রাজা ক'রে দিয়ে তাকে অনেক আশীর্বাদ ক'রে, স্বর্গে ফিরে গেলেন।

সূর্যের সাজা

মাউই ছিল একজন মাওরী। মাওরীরা নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপে বাস করে। মাউই ভয়ঙ্কর যাদু জানত। তার যে দিদিমা ছিল, সে জানত আরো বেশী। সেই বুড়ির এক-একখানা হাড়ের এমনি গুণ ছিল যে, তা দিয়ে যা খুশি তাই করা যেত। তাই মাউই একদিন তাকে বলল, "দিদিমা, আমাকে একখানা হাড় দাও না।" বুড়ি অমনি নিজের চোয়ালের একখানা হাড় খুলে মাউইকে দিয়ে দিল।

তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্যের তখন ভয়ানক গরম আর বেজায় চঞ্চল। সে পুর্ব দিকে এক কোণে উঁকি মেরেই অমনি বোঁ ক'রে ছুটে আকাশ পার হয়ে যেত। ঐটুকুর মধ্যেই সকলে গরমে পাগল হয়ে যেত। এত গরমে কাজ করা মুশকিল, কাজ শেষও হয় না, দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে যায়।

মাউই বলল, "সূর্যটাকে একটু পোষ মানাতে না পারলে চলছে না।"

সবাই তার কথা শুনে হাসল, মাউই কিন্তু কিছু বলল না, মনে মনে মতলব আঁটতে থাকল। সে আর তার ভাইরা মিলে দিনরাত বসে খালি দড়ি পাকাচ্ছে। পাকাতে পাকাতে, প্রকাণ্ড লম্বা এক দড়ি পাকিয়ে ফেলল তারা। অত লম্বা দড়ি আগে কেউ দেখে নি। তারপর সেই দড়িতে এমন মন্ত্র পড়ে দিল মাউই যে, সূর্যের আগুনে দড়ি পুড়বে না।

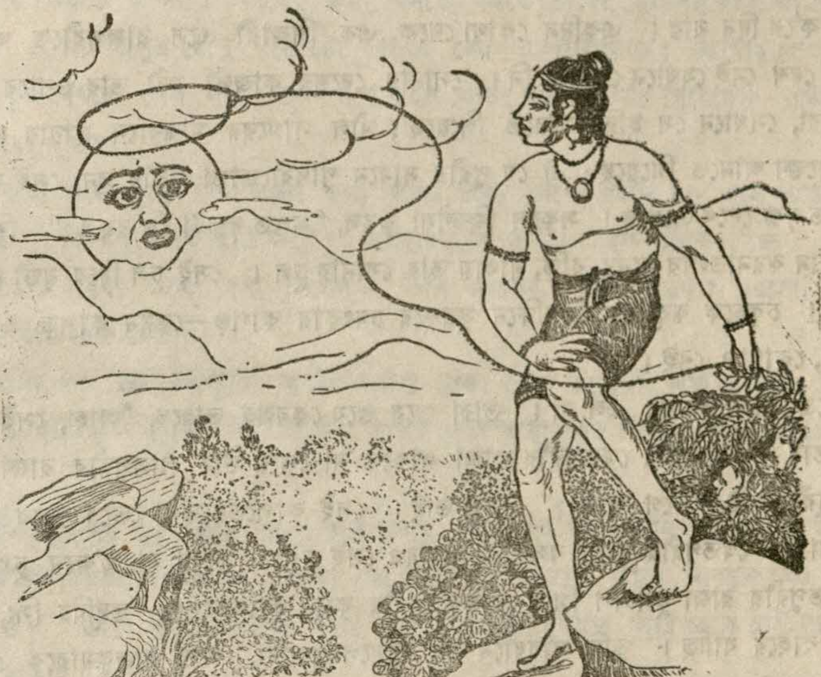
সেই দড়ি নিয়ে তারা কয় ভাই মিলে রওনা হল পৃথিবীর কিনারার দিকে। সকল দেশ সকল সাগরের শেষে পৃথিবীর কিনারা। সেইখানে রোজ ভোরের বেলা এসে সূর্য উঁকি মারে।

মাউই আর তার ভাইরা দিনের বেলায় বনের মধ্যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। রাত্রে যখন সূর্য থাকে না, তখন চলে। কাজেই সূর্য তাদের দেখতেও পেল না, কিছু টেরও পেল না।

এমনি ক'রে শেষে একদিন সূর্য উঠবার একটু আগে তারা পৃথিবীর কিনারায় এসে পৌঁছেছে।

পৌঁছিয়েই মাউই তার ভাইদের বলল, "ঐখান দিয়ে সূর্য উঁকি মারবে, আর অমনি তোরা এই দড়ি দিয়ে সেটাকে আচ্ছা করে বাঁধবি। দেখিস, ছাড়িস না যেন।"

বলতে বলতেই সূর্য হাসতে হাসতে এসে কিনারা দিয়ে উঁকি মেরেছে। এইবারে বোঁ করে দৌড় দেবে আর কি। হঠাৎ হুড়মুড় করে তার মাথায় এসে পড়ল এক দড়ি। সঙ্গে সঙ্গে মাউই আর তার ভাইরা ছুটে এসে আচ্ছা করে দড়ি দিয়ে বাঁধল তাকে। সূর্য তো ভয়ানক ছটফটাল চ্যাচাল। কিন্তু চ্যাচালে কী হবে? দড়ি সে ছিঁড়তে পারল না, বাঁধনও খুলতে পারল না। ততক্ষণে মাউই এসে, তার



হঠাৎ হুড়মুড় করে সূর্যের মাথায় এসে পড়ল এক দড়ি।

দিদিমার চোয়ালের হাড় দিয়ে সূর্যকে এমন পেটাল যে তার তেজগুলো ধোনা তুলোর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শেষটায় তারা ছেড়ে দিল তাকে।

মাউই তাকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দড়ির বাঁধন খুলল না। দড়ির এক মাথা পৃথিবীতে কিনারার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিল মাউই। এখনও নাকি সেই দড়িতে সূর্য বাঁধা আছে। মেঘলা দিনে কখনও কখনও দড়িটা দেখতে পাওয়া যায়।

মেঘলা দিনে সূর্যের গা থেকে যে আলোর ছটা বেরোতে দেখা যায়, সেগুলো নাকি আলো নয়, মাউই-এর দড়ি। মাউই তাই বলত, এবং মাওরীরা তাই বলে থাকে।

রাজার মেয়ে, রাজার ছেলে

রাজার মেয়ের বাপের লালপুরীর পাশে রাজার ছেলের বাপের শ্বেতপুরী। দুই রাজায় ভারী ভাব। তেমনি ভাব তাদের ছেলে-মেয়েদের দুজনের। ছোটবেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে খেলাধূলা ক'রে আসছে। দুই রাজা বলাবলি করে, তাঁদের ছেলেমেয়ে দুটি বড় হলে, তাদের দুজনের বিয়ে দেবেন।

এমনি ক'রে দিন যায়। একদিন কোথা থেকে এক শিকারী এসে রাজপুরীতে অতিথি হল। সে বলে এমন দেশ নেই যেখানে সে যায় নি। সোনার দেশের কাজলী নদী, তার ওপারে থাকে রক্ত-মুখো অসভ্যেরা, সেখানে সে হরিণ মারতে গিয়েছে; নীল সাগরের মাঝখানে ছায়ায় ঢাকা রত্নদ্বীপ সেখানে সে মুক্তো আনতে গিয়েছে; ঐ যে পুরীর সামনে পৃথিবীজোড়া গভীর বন, সেই বনের ওপারে গিয়ে সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখে এসেছে। সকলে জিজ্ঞাসা করল, "অদ্ভুত দৃশ্যটা কি রকম?" শিকারী বলল, "দেখতে পেলাম ঝরনাতলায় বনের বুড়ি, মাথায় তার সোনার চুল। সেই চুল দিয়ে বুড়ী রূপোর তাঁতে কাপড় বুনছে! চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ফিন্‌ফিনে ফুরফুরে চমৎকার কাপড়—তেমন কাপড় এ রাজ্যে নেই, ও রাজ্যে নেই, কোথাও নেই।"

সে রাত্রে রাজাদের ঘুম এল না। তারা শুয়ে শুয়ে কেবলই ভাবছে, "আহা, সেই কাপড় যদি আনতে পারতাম!" শেষটায় শ্বেতপুরীর রাজা থাকতে না পেরে উঠে লালপুরীর রাজার ঘরে গিয়ে বলল, "লালপুরী ভাই, জেগে আছ?" "হ্যাঁ ভাই। সেই কাপড়ের কথা ভেবে ভেবে আমার আর ঘুম আসছে না।" শ্বেতপুরীর রাজা বলল, "আমারও সেই দশা। চলো না, দু'জনে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি।" শ্বেতপুরীর রাজা চুপচাপ গিয়ে রাজভাণ্ডারীর কানে কানে বলল, "তদ্‌বির সিং, আমি কয় দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। তুমি সাবধানে সব সামলে থেকো, আর রাজকুমারকে চোখে চোখে রেখো।" লালপুরীর রাজা তার বাপের আমলের বুড়ো চাকরকে জাগিয়ে বলল, "নিমক্‌রাম, আমি কয়দিন একটু ঘুরে আসছি। তুমি আমার মেয়েকে দেখো।"

তারপর দুই রাজা বুড়ির খোঁজে বনের মধ্যে গেল। সেই যে গেল, আর খবর নেই। এমনি ক'রে সাত মাস চলে গেল। তখন তদ্‌বির সিং নিমক্‌রামকে লোভ দেখিয়ে বলল, "দাদা, বুড়ো হয়ে পড়লে, কয়দিনই বা বাঁচবে। এখন একটু জিরিয়ে নাও। তোমায় নদীর ধারে বাগানবাড়ী দিচ্ছি; শেষ কটা দিন আরামে থাকো। মেয়েটাকে দেখাশোনা আমার গিন্নীই করতে পারবে।" এই ব'লে নিমক্‌রামকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাঠিয়ে দিল পুরী থেকে অনেক দূরে।

তদ্‌বির সিং-এর কাছে থেকে, ক্রমেই রাজকন্যা ও রাজপুত্রের কষ্ট বাড়তে লাগল। ক্রমে এমন হল যে তারা পেট ভ'রে খেতে পায় না, ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে, নোংরা ঘরে মাটিতে শোয়।

এদিকে তদ্‌বির সিং-এর সাতগুষ্টি এসে পুরীতে থাকে। ভাল জিনিস সব তারাই খায়, তারাই নেয়। শেষটায় একদিন ভাণ্ডারীর গিন্নী এসে রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে পুরীর বাইরে তাড়িয়ে দিল। বলল, "যা যা—মাঠে গিয়ে শূয়োর চরা। রাত্রে ঐ হোগলার ঘরে শুয়ে থাকিস্। একটাও শূয়োর যেন না হারায়।"

দুজনে বনের ধারের মাঠে শূয়োর চরাতে গেল। একটা দুষ্ট শূয়োর কেবলি পালাতে চায়। রাজপুত্র তাকে ধ'রে এনে, লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে বলল, "এইখানে শুয়ে থাক্। পালালে পিট্টি খাবি।" তারপরে দুজনে মিলে গল্প করতে লাগল। দুঃখের কথা বলতে বলতে তাদের খেয়ালই রইল না যে বেলা শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ রাজপুত্র দেখে শূয়োরটা আবার কোথায় পালিয়েছে। কোথায় গেল? কোথায় গেল? কোথায়ও দেখতে পেল না। তখন মনে করল নিশ্চয় বনের ভিতর গিয়েছে। এই ভেবে তারা গেল বনের মধ্যে খুঁজতে।

বনের মধ্যে খুঁজে খুঁজে, যখন সন্ধ্যা হল, তারা চেয়ে ছাখে, গভীর বনে এসে পড়েছে। ভারি ভয় হল তাদের। কি করবে, কোথায় যাবে? অসহায়ভাবে দুজনে এদিক ওদিক যাচ্ছে। এমন সময়ে বন আলো ক'রে বনদেবী এসে দেখা দিলেন। তিনি বললেন, "ভয় পেয়েছ? এসো, আমার ঘরে এসো।" তারা তাঁর সঙ্গে গেল।

বনের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বুড়ো বটের জটায় ঢাকা দেহে বনদেবী আঙুল দিয়ে ঠেলা দিতেই, গাছের গায়ে দরজা খুলে গেল। দরজা দিয়ে রাজকন্যা আর রাজপুত্র ভিতরে গিয়ে দেখল—চমৎকার এক বাড়ি!

সেইখানে হরিণের দুধ আর বনের ফল খেয়ে, নরম ঘাসের বিছানায় দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল হ'লে বনদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "বলো তো, তোমরা আমার কাছে থাকতে চাও, না পুরীতে ফিরে যেতে চাও?" তারা দুজনেই বলে উঠল, "না না, দুষ্টু পুরীতে আর যেতে চাই না। আমরা এইখানে থাকতে চাই।"

রাজপুত্র আর রাজকন্যা বনপুরীতে সুখে আছে। একদিন এক বুড়ো কাক উড়ে এসে বলল, "কাঃ কাঃ, কি খবর?" বনদেবী বললেন, "ভুষুণ্ডি দাদা, খবর কি আছে তুমিই বলো।" কাক বলল, "হ্যাঁ, খবর ভাল বটে। কাঠুরেরা সে বছর যত জঙ্গল কেটেছিল সব আবার ভরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। শহরের মানুষ এসে সারাদিন মাটি খুঁড়ছে আর বীজ লাগাচ্ছে।" বনদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "শহরের মানুষরা কেন এমন করছে?" কাক বলল, "তোমার এই নন্দনবন পার হলে খণ্ডবন, তারপরে অন্ধবন। মানুষপুরের লোকেরা এসে অন্ধবনের অনেক গাছ কেটে নিয়েছিল। তাই অন্ধরাজ দুটো হোমরাচোমরা মানুষ ধ'রে এনে, তাদের দিয়ে বন ভরাচ্ছেন।" বনদেবী বললেন, "আহা! তবে তো মানুষ দুজনের খুব কষ্ট হচ্ছে।" "তা হচ্ছে বই কি। ঘরবাড়ি ছেড়ে বনের মধ্যে এসে কেবলি খাটছে আর খাটছে। যতদিন না সারা বনে বীজ পোঁতা হয়, যতদিন না সেই বীজের চারা

গজায়, যতদিন না সেই চারা বড় হয়ে গাছ হয়, ততদিন তাদের ছুটি নেই।" ব'লে কাক উড়ে গেল।

মানুষ দুজনের কষ্টের কথা শুনে রাজপুত্র আর রাজকন্যার ভারি কষ্ট হল। তারা কাঁদতে কাঁদতে বনদেবীকে বলল, "আমরা অন্ধবনে যাব। আমাদের পথ বলে দাও।" বনদেবী বললেন, "নদীর ধারে ধারে উত্তর দিকে বনে যাও, অন্ধবন পাবে। তার কাছেই ভুষুণ্ডি কাক থাকে, সে তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবে। সত্যি কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না, নদীর জল ছাড়া আর কোন জল খাবে না, কোন গাছের ফুল ছিঁড়বে না, ফল পাড়বে না, তা হ'লেই তোমাদের কোনও বিপদের ভয় নেই।"

ভোরবেলা দুজনে কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে বেরোল। দুপুরে শ্রান্ত হয়ে, নদীর ধারে জল খেতে গিয়েছে। এক শিকারী এসে তাদের বলল, "ছি ছি, ওই নোংরা জল কি খেতে আছে? এই নাও, আমি ঠাণ্ডা জল দিচ্ছি।" তারা বলল, "না, নদীর জল ছাড়া আর কোন জল আমরা খাব না।" এ কথায় শিকারী রেগেমেগে চলে গেল। রাত্রে শুকনো ঘাসে শুয়ে রইল তারা।



রাজারা কেবল মাটি খুঁড়ছে

ভোরবেলা উঠে আবার রওনা হল। সেদিনও তারা যখন সঙ্গের খাবার খেতে বসেছে, এক শিকারী এসে বলল, "আরে, ওসব বাসি খাবার খাচ্ছ কেন? গাছে চমৎকার ফল রয়েছে, যত ইচ্ছা পেড়ে খাও।" তারা বলল, "না, আমরা বনের ফুল ছিঁড়ব না, বনের ফল পাড়ব না।" শিকারী এ কথায় রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল।

পরের দিন আবার, যখন তারা নদীর ধারে বসেছে, এক শিকারী এসে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা?" তারা বলল, "আমরা অন্ধবনে যাচ্ছি।" তাতে শিকারী বলল, "চুপ চুপ, অন্ধরাজ শুনতে পেলেই সর্বনাশ। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, কোথাও যাচ্ছি না, নদীর ধারে বেড়াচ্ছি। ছেলেমেয়ে দুটি বলল, "না, আমরা সত্যি কথা ছাড়া আর কোন কথা বলব না।"

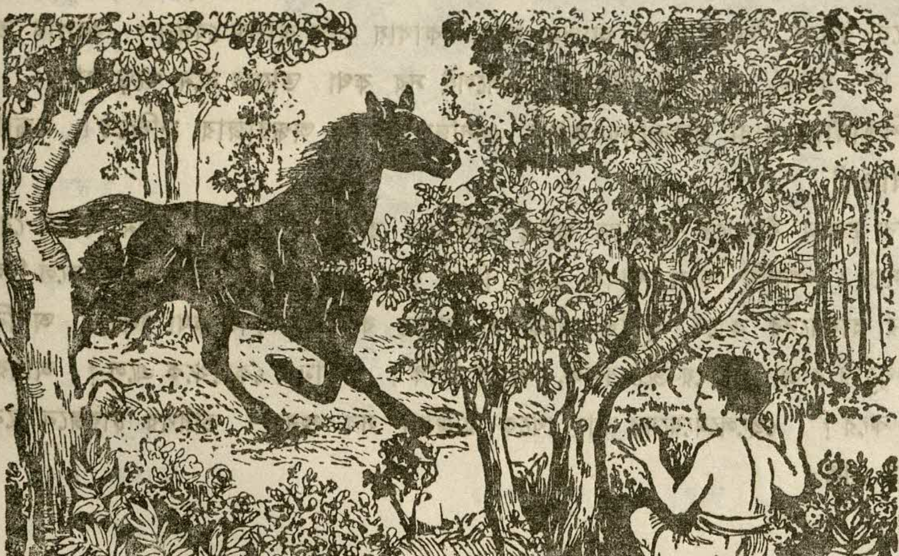
পরের দিন তারা অন্ধবনে পৌঁছল। বনের মধ্যে অনেকখানি জায়গা মাঠের মত খোলা, মানুষেরা সেখানে জঙ্গল কেটে সাফ করেছিল। সেই খোলা মাঠে শ্বেতপুরী আর লালপুরীর রাজা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। তাদের দেখতে পেয়েই, রাজপুত্র আর রাজকন্যা 'বাবা' 'বাবা' ব'লে দৌড়ে গেল। কিন্তু রাজারা তাদের দিকে ফিরেও চাইল না। ছেলে আর মেয়ে তাদের কত বোঝাল, কত কথা বলল, তারা কানেও নিল না। তারা কেবল মাটি খুঁড়ছে আর নিজেরা বলাবলি করছে, "এই জমিটা শেষ হলেই আবার বীজ আনতে যেতে হবে।"

অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে, ছেলেমেয়ে দুটি বিষণ্ণ মুখে এসে নদীর ধারে বসল। এমন সময়ে ভুষুণ্ডি কাক এসে তাদের সামনে বসে বলল, "কাঃ কাঃ—ভাবনা কিসের এত ?" তারা সব কথা জানাল কাককে। "এরই জন্য এত ভাবনা ? তা হ'লে শোনো। যখন ওই পাহাড়ের উপর লাল সূর্য ডুবে যাবে, তখন মানুষেরা তাদের মাটি খোঁড়া ছেড়ে বিশ্রাম করবে। তখন যদি চট্‌পট্ গিয়ে, শাবল দুটোকে নদীর মধ্যে ফেলে দিতে পার, তা হলেই তারা কাজের কথা ভুলে যাবে। তারপর তাদের সামনে গিয়ে বলবে, 'ঝরনাতলায় আপন মনে, কোথায় বুড়ি কাপড় বোনে ? রূপোর তার সোনার চুল, সব কি ফাঁকি, সব কি ভুল ?' বললেই সব কথা তাদের মনে পড়ে যাবে। এতক্ষণ যা হয়েছে, শিকারীরা যারা তোমাদের কাছে এসেছিল সবাই অন্ধরাজার ফন্দিতে। সন্ধ্যা হয়ে এল, শীগ্‌গির যাও।"

তারা দুজনে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল রাজাদের কাছে। রাজারা তখন শাবল রেখে বিশ্রাম করতে বসেছে। অমনি তারা শাবল দুটো নিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দিল। ফিরে এসেই তারা রাজাদের কাছে, ভুষুণ্ডি কাক যা বলতে বলেছিল সেই কথা বলল। অমনি শ্বেতপুরী আর লালপুরীর রাজা লাফিয়ে উঠে বলল, "আরে এ কি ? তোমরা কোত্থেকে এলে ? আমরাই বা বনে এলাম কি করে ?" ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে রাজারা সব শুনল। তারপর চারজনে মনের আনন্দে দেশে ফিরে গেল।

রাত্রের ঘোড়া

রাত্রে উঠে চাষা তার বাড়ির বাগানে বেরিয়ে এল। এসে দেখে সর্বনাশ! আজও বাগান তোলপাড়। ফুলেরা ছিন্নভিন্ন, ছোট ছোট চারাগাছগুলি মুচড়িয়ে ভেঙে গিয়েছে; গাছের ডালপালা চারিদিকে ছড়ানো, যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে বাগানের উপর দিয়ে। কার পায়ের চাপে বাগানের মাটি পর্যন্ত উবড়ো খাবড়ো। সে চেঁচিয়ে তার স্ত্রীকে ডাকল। তার স্ত্রী এসে কাণ্ড দেখে অবাক। এমন সময়ে পাশের জমির চাষা উপস্থিত। সে বলল, "ভাই, আমার বাগানেরও এই দশা। আজ তিন রাত থেকে গ্রামে এমনি হচ্ছে। এর একটা ব্যবস্থা না করলে চলছে না।" তারা জাপানের লোক, ফুল গাছ-পালা খুব ভালবাসে। তাদের কাছে এ রকম উৎপাত অসহ্য।



হঠাৎ কোথা থেকে প্রকাণ্ড এক কালো ঘোড়া এসে বাগান মাঠ তোলপাড় করে ছুটে বেড়াতে লাগল।

দুই চাষার কথাবার্তা চলছে, হঠাৎ চাষার স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল, "ওটা কি? ওই যে নীল রঙের?" সবাই চেয়ে দেখে, দূরে যেন একটা নীল কাপড়ের পুঁটলি প'ড়ে আছে। কাছে যেতে দেখতে পেল, ঘাসের উপর চাষীর ছেলে ঘুমিয়ে আছে। তাদের পায়ের শব্দে ছেলেটি বলল, "বাবা, ঘোড়া, মস্ত বড় কালো ঘোড়া। আমি দেখতে পেয়েছি ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছিল। দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।"

তার বাবা বলল, "আচ্ছা, এখন যাও, ঘরে গিয়ে ঘুমাও। কিন্তু এ গ্রামে কালো রঙের ঘোড়া তো কারও নেই।"

পরদিন রাত্রে সে গ্রামের সব লোক চাষার বাড়িতে জড়ো হয়েছে, পাহারা দেবে বলে। রাত যখন বেশী হল, হঠাৎ কোথা থেকে প্রকাণ্ড এক কালো ঘোড়া এসে বাগান মাঠ তোলপাড় করে ছুটে বেড়াতে লাগল। কোথাও একটু দাঁড়িয়ে হয়ত কচি ঘাস ছিঁড়ে খায় আবার ছোটে। লোকেরা সবাই মিলে দড়ি ফাঁস চাবুক নিয়ে হৈ হৈ করে তার পিছনে ছুটছে, কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারছে না। চাষার ছেলেও আছে তাদের সঙ্গে। ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে একটা মন্দিরের ভিতরে ঢুকে গেল। তারাও পিছন পিছন ঢুকল মন্দিরে। কিন্তু কি আশ্চর্য, মন্দিরের ভিতরে কোথাও ঘোড়াটাকে পাওয়া গেল না। হঠাৎ সেই চাষার ছেলে বলে উঠল, "ঐ যে, ঐখানে! দেখ, ছুটে ছুটে মুখ দিয়ে কেমন ফেনা বেরোচ্ছে।" ব'লে সে তার লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে দেয়ালের উপর আঁকা একটা ছবিতে আলো ফেলল। সবাই দেখল, একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ার ছবি, যেন হাঁপাচ্ছে, আর তার মুখ দিয়ে সত্যি সত্যি ফেনা বেরোচ্ছে!

সবাই বলল, "কার আঁকা ছবি? চলো তার বাড়ি।" এই ব'লে তারা, সেই ছবি যে এঁকেছিল তার বাড়িতে গিয়ে, তাকে বিছানা থেকে টেনে বের ক'রে, একেবারে মন্দিরে নিয়ে এসে বলল, "এ ছবি এক্ষুনি মুছে ফেল, এর উপর আর কিছু এঁকে দাও।"

চিত্রকর ছবির দিকে চেয়ে দেখল, জীবন্ত ঘোড়া যেন তার পানে তাকিয়ে আছে। সেটাকে মুছে ফেলতে তার হাত উঠল না। সে করল কি, ঘোড়ার পাশে একটা খুঁটি এঁকে দিয়ে, ঘোড়াটা তাতে বাঁধা রয়েছে এঁকে দিল। সেই থেকে সে গ্রামে ঘোড়ার উৎপাতও থেমে গেল। কিন্তু চাষার ছেলে যখনি মন্দিরে যেত, তার মনে হত যেন কালো ঘোড়াটা রেগে তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর লাথি মারবার জন্য খুর উস্‌খুস্ করছে।

গাছের গোড়ায় শিকড় কেন ?

আদ্যিকালের কথা কেউ ভাল ক'রে জানে না ; তবে, শোনা যায় যে তখন নাকি গাছেদের গোড়ায় শিকড় থাকত না ; তারা যেমন ইচ্ছা চলাফেরা ক'রে বেড়াত। তাতে পশুপাখিদের খুব অসুবিধা হ'ত। হয়ত বেচারারা দিব্যি আরামে গাছের উপর বাসা বেঁধেছে, কিম্বা গাছের গোড়ায় বাসা বানিয়েছে ;—আর, সন্ধ্যার সময়ে যেই তারা হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, অমনি গাছেরাও যে যার হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। পশুপাখিরা ফিরে এসে ছাখে, গাছেরা কে কোথায় স'রে গেছে তার ঠিক নেই ; নিজের বাসাই খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়ত একজনের বাসা খোলা মাঠেই পড়ে রয়েছে,—গাছ সেখান থেকে সরে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময়ে বেড়াতে বেরিয়ে হয়ত বৃষ্টি নেমেছে। যাবার সময়ে তারা দেখে গিয়েছিল পথের ছুধারে সারি সারি গাছ, কিন্তু ফিরে এসে ছাখে, সব ফাঁকা, গাছেরা নেই, একটু আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। কী মুশকিল !

এই সব ব্যাপারে সকলেই চ'টে যেত। বাঘ বেজায় রাগী, তার রাগ হত সকলের চাইতে বেশী। বাঘের রাগকে অন্য জন্তুরা খুবই ভয় করত। কিন্তু বাঘের মেজাজকে ঠাণ্ডা করবার একটা উপায় ছিল। বাঘ পিঠে খেতে ভারি ভালবাসত। রাগের সময়ে তাকে পিঠে খেতে দিলেই তার রাগ প'ড়ে যেত। তাই জন্তুরা পালা ক'রে তাকে পিঠে খেতে দিত।

ভাল্লুক ছিল পিঠে বানাবার ওস্তাদ। শেয়ালকে বাদ দিয়ে সে সমস্ত জন্তু আর পাখিদের পিঠে বানাতে শিখিয়েছিল। শেয়াল কিছুতেই শিখবে না। সকলে তাকে যখন জিজ্ঞাসা করত, "তোমার পালা এলে, তুমি কি করবে ?" শেয়াল জবাব দিত, "তোমাদের অত ভাবনা কেন ? আমার ভাবনা আমিই ভাবছি।"

শেষটায় একদিন শেয়ালের পালা এসেই গেল। গাছেরা সকলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, বাঘ তাতে রেগে খুন। তাকে ঠাণ্ডা করবার পালা শেয়ালের। শেয়ালের কিন্তু কোন হুঁশই নেই। সে একমনে একটা গল্পের বই প'ড়ে চলেছে। গল্পটা ছিল অতি চমৎকার। বাঘ শেয়ালের অবস্থা দেখে ভাবল,—না জানি কেমন মন-ভোলানো গল্প ! সেও পিছন থেকে উঁকি মেরে গল্পটা একটু পড়ল। অমনি একবারে মুগ্ধ ; ঘাড় নিচু ক'রে গল্পে মেতে গেল, রাগটাগ সব ভুলে গেল।

গাছেরা ফিরে এসে, বাঘ আর শেয়ালের অবস্থা দেখে, একবার বইয়ের উপর উঁকি না মেরে পারল না। গল্পটা এতই ভাল যে গাছেরাও একটুখানি প'ড়ে, আর ছাড়তে পারল না। চারিদিকে তারা ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল ব'লে অন্ধকার পড়ছিল বইতে, তা ছাড়া সন্ধ্যাও হয়ে এসেছিল। শেয়াল তখন আস্তে আস্তে বইখানা বন্ধ ক'রে একটু মুচকি হেসে, তারপর 'হো হো' ক'রে হেসে উঠল। বাঘ

জিজ্ঞাসা করল, "হাসছ কেন ?" শেয়াল তার কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি যেন বলল আর অমনি বাঘও হেসে গড়াগড়ি।

তারপর, রাত হয়ে গেল, বাঘ শেয়াল আর অন্য জন্তুরা মিলে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বইটা পুঁতে ফেলল। সকালে উঠে শেয়াল গাছেদের ডেকে বলল, "কালকে যে চমৎকার গল্প পড়ছিলাম, সেই গল্পের বইটা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। মাটি খুঁড়ে যদি বই বের ক'রে নিতে পার তবে তোমরা বইটা পড়তে পাবে।"



বাঘও পিছন থেকে উঁকি মেরে গল্পটা একটু পড়ল।

গাছেদের গল্পটা খুবই ভাল লেগেছিল, তাই তারা তখনই মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু বই এমন জায়গায় লুকানো হয়েছিল যে গাছেরা সহজে সেটা বের করতে পারল না। যতই তারা খুঁড়ছে, জন্তুরা ততই মাটি ফেলছে গর্তে। শেষটা যখন বেশ গভীর গর্ত হ'ল আর গাছেদের কয়েকটা ডালপালাও মাটিতে ঢুকে গেল, তখন তারা একেবারে আটকা প'ড়ে গেল মাটিতে। সেই ডালপালা-গুলোই নাকি গাছের শিকড় হচ্ছে, আর সেই থেকেই সব গাছের নাকি শিকড় থাকে।

—শেষ—

ছোটদের মনের মত কটি বই

সুখলতা রাও'র

সোনার ময়ূর ৩.০০ গল্প আর গল্প ১৫.০০ কিশোর গ্রন্থাবলী ১০.০০

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুমার ঝুলি ১৮.০০ ঠাকুরদাদার ঝুলি ১৬.০০
দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র ১ম/২য় ৫০.০০ দাদামশাইয়ের থলে ১৫.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কিশোর সাহিত্য সমগ্র ১ম/২য় ৪৫.০০ গান্ধী জীবনী ১.৫০
কিশোর গ্রন্থাবলী ১০.০০ বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন ১ম ১০.০০ ২য় ১০.০০
এ টেল অফ টু সিটিজ ২.৫০ কাউন্ট অফ মণ্টেক্রীস্টো ২.৫০

সুমথনাথ ঘোষের

কিশোর গ্রন্থাবলী ১০.০০ ছোটদের বিশ্বসাহিত্য ২.৫০
ডেভিড কপারফিল্ড ৮.০০ সুইস ফ্যামিলী রবিনসন ১.৫০
কিশোর অমনিবাস ১ম/২য়/৩য় ৩৬.০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কিশোর সাহিত্য সমগ্র
১ম/২য়/৩য়, ৪র্থ/৫ম ৮৬.০০

লীলা মজুমদারের
নেপোর বই ৮.০০

আশাপূর্ণা দেবীর
কিশোর সাহিত্য সমগ্র
১ম/২য় ৫০.০০

